জয় গোস্বামী

সব অন্ধকার ফুলগাছ

¯c‡ivMx

সব অন্ধকার ফুলগাছ

¯c‡ivMx

আ ন ন্দ পে পা র ব্যা ক

সব অন্ধকার ফুলগাছ

জয় গোস্বামীর জন্ম ১০ নভেম্বর ১৯৫৪, কলকাতায়। পরে, ৫ বছর বয়স থেকে সপরিবারে রানাঘাটে। এবং বর্তমানে, ৩০ বছর পর, পুনরায় কলকাতাবাসী। বাবা মারা যান ৮ বছর বয়সে। মা স্কুলে পড়াতেন। মায়ের মৃত্যু ১৯৮৪।

শিক্ষা : একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, রানাঘাটেই। প্রথম কবিতা লেখা, ১৩ বছর বয়সে, বাড়ির পুরনো সিলিংপাখা নিয়ে। প্রথম কবিতা ছাপা হয় উনিশ বছর বয়সে, একই সঙ্গে তিনটি ছোট পত্রিকায়, সীমান্ত সাহিত্য, পদক্ষেপ ও হোমশিখা। পরবর্তী ১৫/১৬ বছর বহু লিটল ম্যাগাজিনে অজস্র লেখা ছাপা হয়েছে। দেশ পত্রিকায় লেখা ১৯৭৬ থেকে, ডাকযোগে, প্রথমে অনিয়মিত, পরে নিয়মিতভাবে। এখন, কিছুকাল হল, এই পত্রিকারই কর্মী।

প্রধানত কবি। বারোটি বই আছে কবিতার। কয়েকটি উপন্যাস বেরিয়েছে, অন্যান্য গদ্য লেখাও।

ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা ? কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৯০ সালে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। ১৯৯৭-এ পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার, বজ্রবিদ্যুৎ-ভর্তি খাতা কাব্যগ্রন্থের জন্য।

শখ : গান শোনা, পুরনো চিঠি পড়া।

¯c‡ivMx

সব অন্ধকার ফুলগাছ

জয় গোস্বামী

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

¯c‡ivMx

আ ন ন্দ পে পা র ব্যা ক

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ মে ১৯৯৭

ISBN 81-7215-709-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

গ্রন্থটি এই শর্ত সাপেক্ষে বিক্রি করা হল যে, প্রকাশকের লিখিত পূর্ব-সম্মতি ছাড়া যে-আকারে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার অন্যরূপ বাঁধাই বা প্রচ্ছদে এবং অনুরূপ ধরন ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদ্ধতিতে ব্যবসা-সূত্রে বা অন্যভাবে এই গ্রন্থ ধার দেওয়া, পুনরায় বিক্রি করা, ভাড়া দেওয়া বা অন্যভাবে প্রচার করা যাবে না। সেই সঙ্গে উপরোক্ত সংরক্ষিত কপিরাইট অধীন অধিকারকে সীমায়িত না-করে পরবর্তী ক্রেতার উপর এই শর্তও আরোপ করা হচ্ছে যে, এই গ্রন্থের কপিরাইটের মালিক এবং উপরোক্ত প্রকাশক, উভয়েরই লিখিত পূর্ব-অনুমতি ছাড়া যে-কোনো পদ্ধতিতে বা যে-কোনো উপায়ে (ইলেকট্রিক, ইলেকট্রনিক, মেকানিক্যাল ফোটোকপিয়িং বা অন্যভাবে) এই প্রকাশনার কোনো অংশ পুনঃপ্রকাশ, মজুত অথবা কোনো পুনরুদ্ধার (রিট্রিভাল) পদ্ধতিতে উপস্থাপন বা প্রেরণ করা যাবে না।

¯c‡ivMx

স্বপন মজুমদার
শ্রদ্ধাস্পদেষু

¯c‡ivMx

সঙ্গীত কল্পনা করে সোমনাথ। নিজে গাইতে জানে না। অন্তত সোমনাথের নিজের তাই ধারণা। অন্য সবাই ওর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত না হলেও, সোমনাথ জানে, সে কেবল সঙ্গীত কল্পনাই করে। এখনও তাই করছিল। এখন কাজে যাবার সময়। এই সকাল সাড়ে দশটায়, স্টেশনের সামনে দিয়ে রিকশা, সাইকেল, ম্যাটাডর, এবং ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের হুড়োহুড়ি ভিড় কাটিয়ে একটু ফাঁকা রাস্তায় পৌঁছতে পৌঁছতে সে একটা লাইনই বারবার ঈষৎ স্বগতোক্তির মতো গাইছিল। 'মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে ওই এলোচুলে।' সোমনাথ এখন কাজে যাচ্ছে। চাকরিতে। সোমনাথ জানে আজ এই গানটা তার সঙ্গে থাকবে। চাকরিস্থলের ভিড়, কাজকর্মে অত ব্যস্ততার মধ্যেও থাকবে। কেউ তার কাছ থেকে সরাতে পারবে না। এবং এরকম, অর্ধমনস্কভাবে কাজ করলেও কাজে সে কোনও ভুলও করবে না। ওই গানটা সঙ্গে থাকবে বলেই করবে না। প্রায় সব দিনই কোনও না কোনও গান তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে সারাদিন। কখনও কখনও একাধিক গানও থাকে। তাই বলে, তারা মোটেই নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি মারামারি করে না। সোমনাথ অবশ্য শুনেছে যে গানের মধ্যে দলাদলি আছে, বাদী স্বর, বিবাদী স্বর, কিন্তু, তাতে সোমনাথের কিছু আসে যায়নি কখনও। কারণ সোমনাথ তো কখনও গান শেখেনি কিনা। সঙ্গীতের শাস্ত্র সে জানে না। না জানুক। গানেরা তার কাছে আসে। তার সঙ্গে থাকে। নানা জটিল কাজ-কর্মে খুব সাহায্যও করে থাকে। মোটেই একা একা লাগতে দেয় না। ভাগ্যিস থাকে। নইলে যে কী হত!

এখন যদিও বসন্তকাল নয়, তবু, হাঁটতে হাঁটতে বারবারই ওই মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, এই লাইনই ফিরে ফিরে গেয়ে চলেছিল সোমনাথ কেননা, সে বুঝতে পারছে, কিছুতেই এই জায়গাটা ওর সরস্বতীর মতো হচ্ছে না। তৃষ্ণা চৌধুরী ওর সরস্বতী। ছোটবেলা থেকে তৃষ্ণা চৌধুরীর গান শুনতে শুনতে এই চুয়াল্লিশ বছরে পৌঁছেছে সোমনাথ। কিন্তু তাঁকে কখনও সামনাসামনি দ্যাখেনি। ইদানীং টেলিভিশনে দু-তিনবার দেখেছে। টিউশনির বাড়ি বা অন্য কোথাও। কিন্তু সামনাসামনি নয়। সোমনাথের বাড়িতেও সাদাকালো একটা টেলিভিশন আছে, কিন্তু গানবাজনা শোনা হয় না তাতে। ওই সময়ে কোনও সিরিয়ালের দিকে ছবি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়।

¯c‡ivMx

নিজের মত প্রকাশ করা সোমনাথের অভ্যেস নেই। সোমনাথ চুপ করে থাকে। তৃষ্ণা চৌধুরীর গায়নরত মুখকেও সে একবার তাপস পাল, দেবশ্রী রায়ের মুখে আছড়ে পড়তে দেখেছিল। দেবশ্রী না হয়ে চন্দ্রাণী সরকার হতে পারে। এদের কাউকে ভাল চেনে না সোমনাথ। খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত নামগুলো সে মাঝে মাঝে শোনে বাড়িতে। সেদিন অবশ্য তৃষ্ণা চৌধুরীর গান অন্য মেয়ের খিলখিল হাসিতে রূপান্তরিত হতে তার শ্বাসকষ্ট হয়েছিল। দম আটকে গিয়ে। কষ্টে। আর সে চুপ করে ছাদে চলে গিয়েছিল। মতামত প্রকাশ করা তার স্বভাব নয়।

সে মতামত জানায়, মাঝে মাঝে, গানকে। সে বারবার মনে মনে গাইতে গাইতে বলছিল গানটিকে, ঠিকভাবে বললে, গানের ওই লাইনটিকে, কেন হচ্ছ না ওরকম, কেন হচ্ছ না। না হয় আমি গান জানি না কিন্তু একবারও কি হতে নেই!

ওরকম, মানে, তৃষ্ণা চৌধুরীর মতো। অন্তত কাছাকাছি। তৃষ্ণা চৌধুরী আর গান করেন না প্রকাশ্যে। এখন তার পুরনো রেকর্ডগুলোই, এটা ওর সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে, ক্যাসেট হয়ে বেরয়। এই 'মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়' অংশটা দুবার ফিরে করেন তিনি রেকর্ডে। ফিরে যাবার আগে, ঢেউ নিয়ে আয়টা এমনভাবে করেন যে সত্যি সত্যিই যেন ঢেউ এসে পড়ে। তা সে বসন্ত কাল হোক নাই হোক! সোমনাথ, এই মুহূর্তে, অর্ধস্ফুট স্বরে গাইতে গাইতে যথাসাধ্য তৃষ্ণা চৌধুরীর গলাটায় ফিরে যাচ্ছে। ক্রমশই গলাটা জীবিত হয়ে মনে পড়ছে তার। সে সঙ্গীত কল্পনা করছে। এবং এই একাগ্র কল্পনা, তার গলাতেও একটু সোনা ঢেলে দিচ্ছে কি না বোঝার আগেই সেই ঘটনাটা ঘটল। সে দেখল, উল্টোদিকে একটা রিকশা বাঁক নিচ্ছে। স্টেশনের দিক থেকে আসা। তাতে যে বসে আছে, তার মোটেই এলোচুল নয়। প্রায় ছেলেদের মতো করে কাটা। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় মুখের ওপর এসে পড়ছে। চশমার ভিতর দিয়ে বড় বড় চোখ চেয়ে আছে তার দিকে। তাকেই দেখছে, ভুল নেই। থুতনিতে একটা বড় আঁচিল।

বুকে ধাক্কা লাগল। রিকশা এগোচ্ছে। সোমনাথ চোখ নামিয়ে নিল পথের উপর। মুখ নিচু করে হাঁটল। দু-চার পদক্ষেপ। তার পাশ দিয়ে রিকশা বেরিয়ে গেল সোজা রাস্তায়। মাঠের সামনে দিয়ে দূরে সোজা রাস্তায়। সোমনাথ দেখল রিকশাটার দুটো পাখা। কিরণমাখা, রৌদ্রোজ্জ্বল দুটো ডানা আছে রিকশাটার। উড়তে উড়তে রিকশাটা মিলিয়ে গেল মেঘে। রিকশা? রথ নয়তো?

সোমনাথ জানে ওই রিকশাটা কোথায় গেল। প্রথম দিকে ক্লাস আছে হয়তো। তাই এত সকালে। আলাপ হয়নি এখনও। আলাপের সুযোগও হয়নি। ওই রিকশায় যিনি ছিলেন, তিনি অধ্যাপিকা। ম্যাডাম। সোমনাথ ক্লার্ক। ওই কলেজেরই।

¯c‡ivMx

২

সোমনাথের বাড়িতে আজ কেউ নেই। সোমনাথ দাঁড়িয়ে আছে দোতলার বড় ঘরটায়। সকাল হয়ে এসেছে। রোদ দেখা দিতে বেশ দেরি আছে যদিও। নীলচে রঙের একটা আভায় সারা আকাশটা ভরা। সোমনাথের বাড়ির উত্তর দিক এটা। এই জানলার পাশেই ছোট একটা বারান্দা। এই জানলা আর একটা মস্ত বারান্দা থেকে সোজা তাকালে কয়েকটা ছোট-বড় বাড়ির পরেই একটা মাঠ আর ভাঙা বাড়ি, তার পিছনে রেল লাইন দেখা যায়। বাড়িটা এক বড়লোক বনেদি বংশের। লাগোয়া মাঠটাও। শরিকানির গোলমালে কেউ ভোগ করতে পারে না। চারদিকে ঝোপ জঙ্গল হয়ে আছে। ভাগ্যিস পারে না। নইলে, ওই মাঠ আর বাড়ি বিক্রি হয়ে কবেই ওখানে লম্বা-বেঁটে-চৌকো সার সার বাড়িঘর উঠে যেত। এখন ওই ভোগদখলহীন বাড়িটার চারপাশে ছোট-বড় নানারকম গাছ। গাছ সোমনাথদের বাড়ির পিছনেও। এই জানালা আর বারান্দায় দাঁড়ালে ডোবা-পুকুর দেখা যায়। ডোবায় জল দেখা যায় না যদিও। কচুরিপানায় ভরা। কিন্তু ওইসব পানার সবুজে সবুজ হয়ে থাকার মধ্যে সাদা কিংবা নীলচে রঙের এক একটা ফুলকে গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সোমনাথ সুযোগ পেলেই দ্যাখে। পূর্বদিক ঘেঁষে আর একটা পুকুরও আছে। সেটা মোটামুটি স্বচ্ছ। লোকে চান করে। পাড়ার দু-চারটে হাঁসও ভাসে। রোদ, সকালবেলা এসে ওই জলে পড়ে। সোমনাথের ধারণা, রোদ, ঘুম থেকে উঠে মুখে জল দিয়ে নেয়। তারপর সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়তে হবে তো। পাড়াটায়, শহরটায়, গোটা পৃথিবীটায়।

সোমনাথ অবশ্য গোটা পৃথিবীর তেমন খবর রাখে না। রেখে কোনও লাভ হয় না বলে রাখে না। বেশিরভাগ দিন খবর কাগজ খুললেই নানা আওয়াজ শুনতে পায় সোমনাথ। বেসুরো সব আওয়াজ। তাই কাগজটা বেশিরভাগ দিনই পড়ে না। না পড়লে, ক্ষতিও কিছু নেই। কারও সঙ্গে তো আর এই জগৎ-ব্যাপার নিয়ে সে আলোচনা করতে যাচ্ছে না! কেউ কিছু বললেও সে চুপ করে শুনে যাবে অন্যের মত। নিজের মত প্রকাশ করা তার অভ্যেস নয়। কেননা, তার কোনও মত নেই। পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিস সম্পর্কেই তার কোনও মত তৈরি হয়নি এখনও।

সোমনাথ বরং শুনবে। না, জগৎ-ব্যাপার সম্পর্কে অন্যদের দিয়ে যাওয়া লাগাতার মতামত নয়। সে শুনবে দু-এক টুকরো গানের কলি। মওকা পেলে গোটা একটা গান। সোমনাথ বরং দেখবে। না, বিরাট কিছু নয়। এই চারপাশটা। তাকিয়ে তাকিয়ে একটু দেখা। এখন যেমন, সকাল হওয়ার ঠিক আগের সকালে, দূরের ওই গাছগুলোর পাতা স্পষ্ট অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে। ডোবাপুকুরের ওই সবুজ পানা দেখতে পাচ্ছে। আন্দাজ করছে ওই সবুজের

¯c‡ivMx

উপরকার শিশিরবিন্দুকে। হাওয়ায়, ভোরবেলা, এই গন্ধটা ভেসে আসে। এটা ভোরেরই গন্ধ। ছোট থেকেই সোমনাথ, এই গন্ধটা পেয়ে আসছে। গন্ধটা কেমন ? গানের গন্ধের মতো। হ্যাঁ, গানেরও গন্ধ আছে। কিন্তু সে তো সকালবেলার নয় শুধু। সকালবেলার গানের একরকম গন্ধ। সন্ধেবেলার গানের আরেকরকম গন্ধ। আর রাত্রিবেলার গান অন্য এক রকমের গন্ধ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। দিনরাত্রির নিজের নিজের গন্ধের সঙ্গে এর মিল আছে। যেমন, মাঝরাতের পর সবাই ঘুমিয়ে গেলে, ছাদে এসে দাঁড়াও যদি, হাওয়ায় একটা গন্ধ পাবে। সেটা মাঝরাতেরই গন্ধ। শেষ রাতের শেষে যে গন্ধটা অন্যরকম হয়ে পড়বে। ভোরের গন্ধের সঙ্গে কেবলই মিশে মিশে যেতে থাকবে। আবার নিঃঝুম রোদের মধ্যে, ভরা গ্রীষ্মে এই ছাদেই এসে দাঁড়াও যদি তবে একেবারে অন্য রকম একটা গন্ধ পাবে। কেমন যেন ঝাঁ ঝাঁ করবে চারদিকটা। গাছগুলো চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকবে মনমরা হয়ে। স্বচ্ছ জলের পুকুরটা উপরে দু-চারটে উড়ে আসা পাতামাত্তর ভাসিয়ে রেখে, নিজেই যেন নিজের জলের নীচে ডুবে বসে থাকবে। দূরের ওই ভাঙা বাড়িটা শুধু বড় বড় শ্বাস ফেলবে মাঝেমাঝে, যখন দেখা যাবে ভাঙা চুনবালি খসে খসে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। হ্যাঁ, ওইরকম দুপুরে মাঠ ভেঙে হাঁটার অভ্যেসও আছে সোমনাথের। রোদ সহ্য করবার অভ্যেসও আছে। তাকিয়ে দেখবার অভ্যেস রাখতে গেলে তো রোদ সহ্য করতে হয়। এইরকম গ্রীষ্মের একটা দুপুরে দূরের রেললাইনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সোমনাথের মনে হয়েছিল, লাইনটা যেন এঁকে বেঁকে গা মোচড়াল, গরম সহ্য করতে না পেরে।

এইরকম দুপুরের সত্যিই একটা নিজের মতো গন্ধ আছে। আবার এই দুপুর যখন ঢলে যাবে বর্ষাকালের সন্ধের দিকে, মাঠের পারে রেললাইনের পারে যখন নেমে পড়বে সূর্য, আর দেখা যাবে না তাকে, অন্যরকম একটা নীলচে-কালো রং আকাশটায় দ্রুত উঠে আসতে থাকবে, আর পাখিগুলো, উড়ে বেড়াতে থাকবে আকাশময়, আর ডাকবে সারাক্ষণ, সেই আসন্ন সন্ধেরও একটা গন্ধ আছে। সোমনাথ চুপচাপ বুঝতে পারে। ছাদে দাঁড়িয়ে বা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারে। স্বচ্ছ পুকুরটায় ছোট একটা ঢিল ফেলতে ফেলতে, বুঝতে পারে। বুঝতে পারে দু'চার ছ'দশ কলি গান মনে আনতে আনতে। গুনগুন করে সেই গানের কাছে, সেই গানগুলিকে প্রথম শুনতে পাওয়ার সময়টির কাছে ফিরতে ফিরতে। বুঝতে পারে স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবে দেখতে পায় সেইসব গানেরও নানারকম রং। রং পালটে পালটে যায়। যেমন এই দিনেরবেলার সকাল দুপুর বিকেল সন্ধের রং। মেঘ-সূর্যাস্ত বৃষ্টি-বাদল বা ছাতফাটানো পিচগলানো রোদের রং। স্পষ্ট-অস্পষ্টভাবে দেখে ও বোঝে সোমনাথ।

বোঝে তৃষ্ণা চৌধুরীর গান শুনতে শুনতেও।

তৃষ্ণা চৌধুরীর গান প্রথম কবে শুনেছিল, আজ আর মনে নেই সোমনাথের। তবে তৃষ্ণা চৌধুরীর নামটা প্রথম শুনেছিল শৈল ঘোষালের

¯c‡ivMx

কাছে। শৈলকুমার ঘোষাল ছিলেন তাদের স্কুলের হেডমাস্টার। ওই রেললাইন পেরিয়ে যেতে হয় তাঁর বাড়ি। যেতে হত। কতদিন গেছে সোমনাথ। শৈল ঘোষাল গান গাইতে জানতেন।

সে নিজে তো গান জানে না। তাই গানের রং বিষয়ে বলতেও পারে না। সোমনাথ যে গান জানে না, এ বিষয়ে অবশ্য সবাই একমত হবে না। হয়ও না। কিন্তু সোমনাথ নিজে বিশ্বাস করে সে জানে না। কারণ, সে তো কখনও শেখেনি। না শিখলে কি গান গাওয়া যায় ? না, যায় না। যদিও সোমনাথ গান করে মাঝে মাঝে। না জেনেই করে। শুনে শুনে শেখা গান। অন্যরা তারিফও করে। ধরে-বেঁধে গাইতে বসিয়েও দেয় কোথাও কোথাও। এও বলে, যে শিখলে তোমার গান হত। শিখলে সত্যি সত্যিই হত কি না সেটুকুও জানে না সোমনাথ। কেননা, গান তো খুব কঠিন জিনিস। শৈল ঘোষাল বলতেন। বলতেন, প্রাণটাকে গানের কাছে আনতেই অনেক সময় লেগে যায়। অনেক বছর। আর পুরো সেই সময়টা ধরে রেওয়াজ, চর্চায় তৈরি করে রাখতে হয় গলাকে। কেননা, গান যখন আসবে, তখন যেন সে ঠিক ঠিক চলতে পারে। বেসুরে ঠোক্কর না খায়। দমের জন্য হাঁফ না ধরে গানের, গান যেন ছুটতে ছুটতে, উড়তে উড়তে যাওয়া-আসা করতে পারে, গানের যেন কষ্ট না হয়, আবার ইচ্ছে করলে শুয়ে বসেও যেন জিরিয়ে নিতে পারে গান। বিলম্বিত বা তালছাড়া হয়ে। বলতেন শৈল ঘোষাল। সেইজন্যই শিখতে হয়। না শিখলে হয় না। বলতেন গান ছাড়া অন্য কিছু ভাবলে গান হয় না।

এই একটা কথাই সোমনাথ নিজের সম্পর্কে স্বীকার করে। সে গান ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না।

এখনও পারছিল না। এই সকালবেলার আগের সকালে, দূরে ওই গোমড়ামুখো ভাঙা বাড়িটার মাথার উপর উড়ে বেড়ানো ডেকে বেড়ানো পাখিটা যে বাড়িটার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছে এটা একদৃষ্টে দেখতে দেখতেই তার মনে পড়তে লাগল : প্রভাতে যারে দেখিবে বলি/ দ্বার খোলে কুসুমকলি/ কুঞ্জে ফুকারে অলি...

এই সময় ঘরের মধ্যে একটা গুঞ্জন প্রবেশ করল। এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াতে থাকল সেই গুঞ্জন।

যদিও এক্ষুনি কোনও কুসুমকে ফুটতে দেখছে না সোমনাথ। অলিও দেখা যাচ্ছে না কোথাও, তাও সে, সোমনাথ, ওই গানটাই ধরে বসল। ছাড়া গলা তার। ভারী নয়, মিষ্টি। উপরে যেতে পারে অনায়াসে। কুঞ্জে ফুকারে অলি, এই কথাটা দুবার ফিরে ফিরে গাইবার সময় কুঞ্জের দন্ত্য নটা যেন ঘরময় সামান্য ঝনঝন করে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। ইস, এইখানটায় কী কী পর্দা লাগে আজও জানে না সোমনাথ। কোনও দিনও জানবার সুযোগ হবে না। না, জানুক। এই মুহূর্তে, সকালের এই দোতলার ঘরে, বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে সোমনাথ নির্ভয়ে ছেড়ে দিল নিজের গলাকে।

¯c‡ivMx

নির্ভয়ে, কারণ বাড়িতে আজ কেউ নেই। কেউ মানে একজন। মাসতুতো বোনের বাড়িতে গেছে। স্বাধীন ও সংকোচহীনভাবে গেয়ে যেতে লাগল সোমনাথ, যাঁহারে বারে বারে... সে ডাকে আমারে, সে ডাকে...। তৃষ্ণা চৌধুরীর মতো হবে না কিছুতেই। শৈল ঘোষালের মতোও নয়। তবু সে গাইতে গাইতেই বুঝতে পারল, পাশের স্বচ্ছ পুকুরের জলে রোদ এসে মুখে ছোঁয়ালো, আর সঙ্গে সঙ্গে রং বদলাল জল। হাঁসেরা ডানা ঝাড়ল। এতক্ষণ আন্দাজ করা দু-চার ফোঁটা শিশির, ঝকমক মুখ দেখাল সবুজ কচুরিপানার ওপর। গাইতে গাইতে সোমনাথ বুঝতে পারল, আজ সারাদিন হয়তো এই গানটা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কলেজে যাবে, চায়ের দোকানে বসবে, হোটেলে খাওয়াবে বা ঝোল-ভাত রান্না করাবে তাকে দিয়ে। সব সময় সঙ্গ দেবে। এই গানটা। সে ডাকে আমারে...

গাইতে গাইতে সোমনাথ দেখল, সকালবেলার আগের সকালে, বাড়ির দোতলার ঘরে দাঁড়িয়ে দেখল, রাস্তা থেকে— যদিও সামনে কোনও রাস্তা নেই— তবু, রাস্তা থেকে একটা সাইকেল রিকশা দুটো ডানা লাগিয়ে উড়তে উড়তে চলে গেল কলেজের দিকে।

৩

সোমনাথ চমকে উঠল। আরে! এটা কী দেখল সে! কাকে দেখল? আর এই দৃশ্য দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গান অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। গলা ক্ষীণ হয়ে নেমে পড়তে লাগল। কিন্তু, তৎক্ষণাৎই উপর্যুপরি আরও দুটি দৃশ্য, মনশ্চক্ষে ঝাপটা মারল তাকে। সে দেখল, একটি মুখ, ছেলেদের মতো ক'রে কাটা চুল, বাতাসের ধাক্কায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে সেই মুখে। স্টিল চশমার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থাকা দুটো বড় বড় চোখ। তার দিকে চেয়ে আছে। থুতনিতে একটা বড় আঁচিল।

এরকম তো হওয়ার কথা নয়! এ তো নতুন ম্যাডাম। এই মুখ তার সামনে এল কেন?

এটা তো দিন তিনেক আগের ঘটনা। কলেজ যাওয়ার পথে দেখেছিল, রিকশায়। নতুন ম্যাডাম। সেদিন, সে কলেজে গিয়ে কী কী করেছিল? ওই নতুন ম্যাডামকে দেখেছিল কি?

দেখেছিল মানে, চোখে পড়েছিল আর কি!

সে যেখানে বসে, হেডক্লার্ক উমাপদবাবুর চেয়ারের একটু দূরের চেয়ারে, সেখান থেকে উল্টোদিকের ঘরটা দেখা যায়। সেটাই স্টাফ রুম। সুইংডোর দিয়ে যাতায়াত। অর্থাৎ ঘরে, ভেতরে বা বাইরে, কেউ দাঁড়ালে, মোটামুটি লম্বা হলে, তার মাথা দেখা যায়। সোমনাথ লম্বাই, ফলে সে, দাঁড়ালে বা হেঁটে গেলে অন্য ঘরের লোকেদের চুল, কপাল, কখনও কখনও চোখ পর্যন্ত দেখতে

¯c‡ivMx

পারে। সোমনাথ একজনের চোখ দেখতে পায়। তার দিকে চেয়ে আছে। সোমনাথ চায়ের কথা বলতে গেলে দেখতে পায়। চায়ের কথা সোমনাথ সারা দিনই একটু বেশি বলে। চায়ের কথা বলা মানে অর্ডার পাঠানো। কলেজের পিছন দিকের দোকানে। পিছনে সরু একটা পিচরাস্তা। তারপরেই মাঠ। মাঠের পারে কাপড়ের মিল। পিচরাস্তার উল্টোদিকেই চা দোকান। দরমার ছাদ। বাঁশের ছোট ছোট বেঞ্চি সামনে। পর পর কয়েকটা দোকানের একটা হল, এই কলেজ কমনরুমের পিছনেরটা। সোমনাথরা যে ঘরে বসে, অর্থাৎ অফিস ঘরে, কয়েকটা জাফরি দেওয়া জানলা আছে। রাস্তার দিকে। সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে হয় চায়ের কথা। এখন অবশ্য আর ঠিক চেঁচিয়ে বলতে হয় না। জানলা দুটোর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই হয়। ওরা ওদিক থেকে দেখতে পেলে আঙুল তুলে এক-দুই বা পাঁচ দেখাতে হয়। কলেজে দু-তিনজন বেয়ারা আছে। তাদের সবসময়ই একটু ব্যস্তসমস্ত ভাব। স্যার-ম্যাডাম-প্রিন্সিপ্যাল বা বড়বাবুর কাজ। সোমনাথ এটুকুর জন্য আর পারতপক্ষে বিরক্ত করতে চায় না তাদের। তা ছাড়া সে সারাদিন দশ কাপ চা খায়ই। কী দরকার বারবার অন্যদের বলে। অবশ্য বেয়ারাদের কেউ না কেউ প্রায় সব সময়ই বসে থাকে দোকানে। তারাও দেখতে পেলে বলে দেয় দোকানিকে, সোমনাথদার চা। কিন্তু তার জন্য, জানলায় দাঁড়াতে হয় একবার। আর জানলায় যাবার পথে ওই সুইংডোরের মাথার ওপর দিয়ে ঘরটার ভেতরে চোখ পড়েই মাঝে মাঝে। পড়তেই পারে, চা বলতে যাবার সময়।

আজকাল কি একটু বেশি বেশিই চা বলছে সোমনাথ। বেশি বার যাচ্ছে চা বলতে! আর বেশি বেশিবার কি চোখ পড়ে যাচ্ছে তার? আজকাল?

আজকাল মানে আবার কী? না ঠিক নয় এই অভিযোগ। সেইদিন, কলেজ যাবার পথে স্টেশনে ওই হঠাৎ রিকশার ওপর নতুন দিদিমণিকে দেখতে পাবার পর, কলেজে পৌঁছে দু-তিনবার নিশ্চয়ই চোখ চলে গেছে ওই দরজা টপকে ঘরের দিকে। কিন্তু সে কি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি?

না, কখনওই নয়।

নয় যদি, তবে আজ আবার ওই রিকশাকে ডানা মেলে উড়তে দেখলে কেন? কেন দেখলে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে চুল? বাতাস লেগে? কিন্তু সেই বাতাস তো এক সপ্তাহ আগের? তা হলে? এখন তো কোনও বাতাস ওঠেনি? এই সকালে?

না, সোমনাথ নিজের কাছেই ধরা পড়ছ তুমি। তোমার মন এদিক-ওদিক যাচ্ছে। এটা ঠিক নয়। মনে রেখো, তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একজন নয়, দুজনের কাছে।

গান থেমে গেছে অনেকক্ষণ। মনটা কেমন যেন হয়ে গেল সোমনাথের। আজ আর চা-বানাতে ইচ্ছে করছে না। বেরিয়ে কোথাও খাওয়া যায়।

¯c‡ivMx

সাড়ে ছ'টা বাজে। নীচের স্বচ্ছ জলের পুকুরটার ধার দিয়ে দিয়ে পায়েচলা যে পথটা মাঠের দিকে চলে গেছে ওইটা দিয়ে হাঁটতে ইচ্ছে করছে। সারা মাঠের ঘাসের উপর তেরছা হয়ে হেলে আছে রোদ। ছোট বড় গাছগুলো গায়ে রোদ লাগিয়ে হেলানো সব ছায়া ফেলেছে। ভাঙা বাড়িটার ভাঙা পাঁচিল ভাঙা ছাদ আর ভাঙা আলসেতেও রোদ ভাঙছে। ওদের পাশ দিয়ে দিয়ে ওই রাস্তাটিতে হেঁটে গেলে হয়!

কিন্তু রাস্তাটা তো গেছে রেললাইনের দিকে। একটু উঠে, উঁচুমতো লাইনটাকে পার হয়ে চলে গেছে লাইনের ওপারটায়। চায়ের দোকান, ওই পথে গেলে, বেশ দূরে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ওই রেল লাইনটার কাছে যেতে, ওটা পেরোতে আর ইচ্ছে করে না সোমনাথের। ওইটা পার হয়েই মাস্টারমশাই থাকতেন কিনা। শৈল মাস্টারমশাই। ওটা পার হয়েই তো যেতে হত তাকে।

সে সব কথা থাক। আগে সকালের চা-টা দরকার। কিন্তু এই সক্কালবেলাতেই স্টেশনের দিকে যাবার মানে হয় না। স্টেশনের সামনেই বাজার। সেখানে এখন বাজার যেতে শুরু করা লোকেদের ভিড়। বস্তা নামানো, ঝুড়ি তোলা, ঠেলা, ভ্যান রিকশাটা, ম্যাটাডরের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলতে চলতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া সকাল সেখানে। যাক, আগে বেরোই তো, ভাবল সোমনাথ।

নীচে নেমে, দরজায় তালা দিয়ে লম্বা উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার দিকে এগোতে এগোতে শুনল সোমনাথ : একটু আগে কে গান গাইছিল, কাকু আপনি?

ঘুরে দেখল সোমনাথ, একটি মেয়ে। নতুন ভাড়া এসেছে এরা। এই বাড়ির একতলার ডানদিকের লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। হাতে চায়ের কাপ। তক্তপোশে বইখাতা। বছর কুড়ি বয়স হবে মেয়েটির। নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। যদিও তাদের কলেজেই পড়ছে। ঢুকেছে নতুন। বাবার বদলির চাকরি বলে।

সোমনাথ থতমত খেল, হ্যাঁ, মানে ওই আর কি।

—আমি তাই ভাবছি। আর তো কেউ নেই ওপরে। মানে কাকিমা তো নেই। কাকু ছাড়া কে আর গান গাইবে?

পাশের ঘর থেকে মেয়ের মা বেরিয়ে এল —মেয়ে তো সাতসকালে উঠে বইখাতা নিয়ে বসে। আমি শুয়ে আছি, ডেকে বলছে, মা মা কে গান গাইছে, শোনো। কে বলো তো!

সসংকোচে বলে সোমনাথ, ওঃ, তুমি পড়ছিলে বুঝি! আমি বুঝতে পারিনি। ডিসটার্ব হয়নি তো!

মেয়েটি বলল, ডিসটার্ব? কী সুন্দর গলা আপনার। এইরকম ভাল গান

¯c‡ivMx

করেন আপনি ! কাকিমা তো কখনও বলেননি ।

সোমনাথ অস্বস্তিভরে বলে এ তো বলবার মতো কিছু নয় ।

মেয়েটির মা পাশের ঘর থেকে চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে এসে বলে, দাদা, চা খান !

সোমনাথ বলে, চা, না মানে...

—খান না । দিদি তো বাড়িতে নেই । চা খাওয়া নিশ্চয়ই হয়নি সকালে । নিন । বসুন না । বসুন ।

—না, না, ঠিক আছে, বলতে বলতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নেয় সোমনাথ । অভ্যাসবশত চুমুক দিয়েও বসে সকালের প্রথম চায়ে । সুন্দর চা । কিন্তু সকালবেলার চা-টা প্রধানত একলা খাওয়ারই স্বভাব রয়েছে সোমনাথের । ভোরবেলার স্বভাব । কিছু পরে, দ্বিতীয় কাপ চা বানিয়ে অন্যজনকে ডাকতে হয় । তার আগে প্রথম চায়ের সময়টায় একলা থাকাটাই তার পছন্দ । নিজের সঙ্গে নিজে চা খেতে খেতে দিনটা তবে শুরু করতে পারে সোমনাথ । এই সময় অন্য লোকের উপস্থিত থাকা, অপরকে অ্যাটেন্ড করতে বাধ্য হওয়া, তার ভেতরটায় বাধা তৈরি করে । সকাল বোঝার বাধা । সকালকেও তো রোজ বুঝতে হয় । তাই না ? আজ, অবশ্য, অগত্যাই সকালবেলার সুন্দর চায়ে একের পর এক অনিচ্ছুক আর বিস্বাদ চুমুক দিতে থাকে সোমনাথ । আর মেয়েটি তাকে বলে, আপনি কার কাছে গান শিখেছেন, কাকু ?

সোমনাথ আবার অস্বস্তি কাটায়, বলে, আমি তো গান শিখিনি ।

—শেখেননি ?

—না, মাস্টারমশাই একজন পেয়েছিলাম । কিন্তু গান শিখতে পারিনি । গান আমি জানি না !

—সে কী ! এই যদি গান না-জানা হয়...

কথা শেষ না করে মেয়েটি চেয়ে থাকে তার দিকে । মেয়ের মাও চেয়ে থাকে । সোমনাথ দ্যাখে, তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা মেয়েটির চোখ ধীরে ধীরে তৃষ্ণা চৌধুরীর চোখ হয়ে যায় । রেকর্ডের কভার থেকে তাকিয়ে থাকা তৃষ্ণা চৌধুরীর চোখ । সোমনাথ দ্যাখে, তৃষ্ণা চৌধুরীর চোখ ধীরে ধীরে রিকশার উপর থেকে তাকিয়ে থাকা চোখ হয়ে যায় । স্টিল চশমার পিছন থেকে তাকিয়ে থাকা চোখ । নতুন ম্যাডামের চোখ ।

সোমনাথ কোনও মতে চায়ের কাপ বারান্দায় নামিয়ে রেখে বলে একটু কাজ আছে । আজ যাই !

¯c‡ivMx

সোমনাথ আজ কলেজে ঢুকতে গিয়ে দেখল, গেটে ইংরেজির সুবীরবাবু দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি সোমনাথ। একটু পরেই পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে, সময় পাওয়া যাবে না।

সোমনাথ অবাক হয়, বলুন স্যার।

—শুক্রবার দিন তো পরীক্ষা মিটে যাচ্ছে। ওইদিন আমরা একটা গেট টুগেদার করব আর কি!

—ও আচ্ছা।

—তুমি সেখানে কয়েকটা গান গাইবে। না, আপত্তি করলে শুনব না।

—গান? স্যার, মানে...

—জানি, পরীক্ষা তো। তোমার কাজ থাকবে। কিন্তু, সেদিন তো ফার্স্ট-হাফ শুধু। একটার পর তো তুমি ফ্রি। ও হয়ে যাবে ঠিক। এসো, কেমন?

সোমনাথদের কলেজে এখন পরীক্ষা চলছে। সত্যি সত্যিই পরীক্ষার সময় সোমনাথের কাজের চাপ বেশিই থাকে। প্রশ্নপত্র এলে তার ব্যবস্থা। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে এই সময় কাজটা সরাসরি হয়ে পড়ে। কখনও বা ইনচার্জ থাকেন একজন। পরীক্ষা শেষ হবার পর খাতার স্তূপ ঠিক ঠিকভাবে বাঁধাছাঁদা করা। ঠিক ঠিকভাবে পাঠানো। পরীক্ষা শেষ হবার পরও অনেক দায়িত্ব। হেড ক্লার্ক উমাপদবাবুর বয়স হয়েছে। তিনি খানিকক্ষণ দাঁড়ান। তারপর, সোমনাথ তা হলে রইল, বলে প্রিন্সিপ্যাল বা ইনচার্জকে বলে চলে যান। সোমনাথ, দুজন, কখনও বা একজন বেয়ারাকে নিয়ে বাণ্ডিল বাঁধা বা সিল করার কাজগুলো সারে। বাইরে থেকে সোমনাথকে সবসময় আনমনা দেখালেও খুব দায়িত্ব নিয়ে এই সব কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে সোমনাথ। এই ব্যবস্থায় যতটাই নিখুঁত হওয়া সম্ভব, সে হয়। অনেক বার হয়ে দেখিয়েছে সেটা। এই সব কাজকর্ম যখন করে সোমনাথ, কিংবা অ্যাকাউন্টসের জটিল হিসেবপত্র করে তখন, বেশ ঘর্মাক্ত অবস্থায়ই, তাকে সারাক্ষণ একটানা, নিচুস্বরে গুনগুন করে গান গাইতে দেখা যায়। যখন কলেজে অডিট চলে, তখনও, সেই প্রায় দিনরাত কলেজে থাকার সময়েও সোমনাথ দু-তিনবার গুনগুন করে ফেলেছিল। হেড ক্লার্ক উমাপদবাবু তাকে মৃদু বকা দেবার পর, অডিটার দুজন ভ্রূ তোলার পর এবং প্রিন্সিপ্যাল কড়া চোখে তাকানোর পর সে অন্তত অডিট বা সিটিং চলাকালীন কোনও দিন গুনগুন করেনি। তা ছাড়া অন্য সময় তাকে এ নিয়ে কেউ বাধা দেয়নি, কারণ, আনমনে গান গাইতে গাইতে সোমনাথ অনেক জটিল, কঠিন, বুদ্ধির এবং বিরক্তিকর কায়িক পরিশ্রমের কাজও নির্ভুলভাবে করে ফেলতে পারে।

¯c‡ivMx

সব সময়েই এই গান করাটা অবশ্য শৈল ঘোষালের অভ্যেস ছিল না। গানের সময় ছাড়া গান গাইতেনও না তিনি। শৈল ঘোষাল ছিলেন অল্প বয়সে বিপত্নীক। নিঃসন্তান। ভাগনে-ভাগনিদের মানুষ করেছিলেন। লোকে আড়ালে তাঁর মাথায় ছিট আছে বললেও, সামনে কিছু বলতে সাহস পেত না। এমনিতে খুব ডিসিপ্লিনড ছিলেন। স্কুলে গান গাইবার কথা তিনি ভাবতে পারতেন না। কেবল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, স্বাধীনতা-দিবস বা রবীন্দ্র-জয়ন্তী, এই ধরনের বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া স্কুলে গাইতেন না শৈল ঘোষাল। সেখানে তিনিই ছিলেন প্রধান গায়ক। শৈল ঘোষালকে সোমনাথ প্রথম দেখেছিল আট বছর বয়সে।

না, শৈল ঘোষালকে নয়। দেখেছিল শৈল ঘোষালের বিদ্যাসাগরী চটি পরা পা দুটো। দেখেছিল স্কুলেই। তার মানে কি শৈল ঘোষাল বিদ্যাসাগরী চটে পরে স্কুলে আসতেন ? না, কখ্খনও না। তিনি স্কুলে আসতেন পুরো সাহেবি পোশাকে। কিন্তু উৎসবের দিন, ফাংশনের দিন, তাঁর থাকত ধুতি পাঞ্জাবি আর বিদ্যাসাগরী চটি।

সোমনাথ তখন ওই স্কুলে পড়ে না। বাবার হাত ধরে একদিন বিকেলে ঘুরছিল, হঠাৎ গানের আওয়াজ পেয়ে বাবা বলল, আরে ! কে গাইছে ! চল তো ভেতরে। যে গানটা হচ্ছে সেটা তো সোমনাথের খুবই চেনা গান। বাবাই তো করে। ধনধান্যে পুষ্পে ভরা !

বাবার হাত ধরে গুটিগুটি ঢুকে পড়ল সোমনাথ, শিব চৌধুরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, যেটা পরে তার স্কুল হবে।

স্কুলের সামনের কম্পাউন্ডে হচ্ছে অনুষ্ঠান। মঞ্চটা সামনের দিকে। যদিও সেটা দেখতে পাচ্ছে না সোমনাথ। অনেক লোক। তার মতো, তার চেয়ে বয়েসে বড় ছেলেও অনেক। এখন বুঝতে পারে সোমনাথ, গার্জেন, টিচার, স্টুডেন্ট, তার সঙ্গে সেদিন ছিল বাইরে থেকে ঢুকে পড়া কৌতূহলী লোক। আর সেই সব লোকেদেরই একজন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তার বাবা, বাবার হাত ধরে সোমনাথ।

গানটা তখন আরও স্পষ্ট। বাবা ছটফট করে উঠে উদ্দেশ্যহীনভাবে বলল কে গাইছে ? কে গাইছে ? কে ? কেউ একজন বিরক্ত উত্তর দিল, চেনেন না ? হেড স্যার। বাবা ভিড় ঠেলে ঠেলে তাকে নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল, অন্যদের বিরক্তি অগ্রাহ্য করে। একসময়ে আর পারল না। দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাবার হাত ধরে দাঁড়িয়ে সোমনাথ শুধু লোকের পিঠ, প্যান্টে শার্ট-গোঁজা কোমর, সাদা পাঞ্জাবির পেছন দিক, ঝুলন্ত কনুই, হাত এই সব দেখতে পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে, সামনের একটু নড়াচড়া। আর তার হাত বার বার মুঠো করে ধরছিল বাবা। বাবা এমন ছটফট করছিল যে, লোকেরা পাশ ফিরে ফিরে দেখছিল বিরক্তি বা কৌতুক নিয়ে। সোমনাথ দু-চারবার বাবার আঙুল টানল, কোলে নাও, কোলে নাও, বাবা দেখতে পাচ্ছি না। কোলে নাও ...

¯c‡ivMx

বাবা মুখ নামিয়ে বলল, কোলে ? অ্যাঁ, কোলে নেব ? নিই !

সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে বলল, না বাবা, নিতে হবে না, দেখতে পাচ্ছি। ওই তো।

বাবা ছেড়ে দিল। আর জোর করল না।

বাবার শরীর ভাল যেতে কোনও দিনই দ্যাখেনি সোমনাথ। রোগা-ফর্সা-লম্বা। এখনকার সোমনাথের চেয়েও লম্বা। বাবা সোমনাথকে কোনও দিনই কোলে নিতে পারত না। মানে, একটু জ্ঞান হবার পর, সোমনাথের মনে পড়ে না, কোনও দিন বাবা তাকে কোলে নিয়েছিল কি না।

মা বারণ করে দিয়েছিল তাকে, না বাবার কোলে উঠবে না। বাবাকে বলবে না কোলে নিতে। বাবার কষ্ট হবে। যখন কোলে চড়তে ইচ্ছে হবে আমার কাছে আসবে। আর এত কোলে ওঠার বাতিকই বা কেন ! বড় হচ্ছ না ?

তবু বাবার কোলে না উঠলে কি হয় ? বাবাকে খাটের পাশে দাঁড় করিয়ে, ৬ বছর ৭ বছর ৮ বছর ৯ বছরের সোমনাথ, বাবার দু কাঁধে দুটো হাত আর একটা পা কোমরে দিয়ে বলত, এই তো, এই তো কোলে উঠলাম।

বাবা অসহায় মুখে হাসত।

তারপরই সেই পা-টা নামিয়ে শরীরের ভরটা ওই পা থেকে সরিয়ে এই পায়ে এনে, অন্য পা-টা আবার বাবার অন্যদিকের কোমরে পেঁচিয়ে বলত, কোলে উঠলাম, কোলে উঠলাম। শরীরের ভার বাবার ওপর দিত না কখনওই। মা বারণ করে দিয়েছিল।

বুকের দোষ ছিল বাবার।

আজও সোমনাথের মনে আছে সেই দিনটার কথা। শৈল ঘোষালকে প্রথম দেখার দিন বলেই হয়তো আছে। গান শুনে বাবাকে অত ছটফট করতে দেখে, সে সোমনাথ, তার আট বছরের বিচারবুদ্ধি হারিয়ে বসেছিল। কে গাইছে, কে গাইছে এই কৌতূহলটাই জয়ী হয়েছিল সেদিন। সোমনাথের এখনও মনে পড়ে বাবার মুখটা, গানের বিস্ময়মুগ্ধতা মাখা মুখটা কেমন চকিতে বিপন্ন হয়ে গেল, কোলে ? অ্যাঁ ? কোলে ? নিই !

অসহায় দেখাল বাবাকে।

সঙ্গে সঙ্গে বুকটা মুচড়ে উঠল সোমনাথের। বলল, না থাক, এই তো, এখন দেখতে পাচ্ছি।

বাবার সেই মুখটা মনে করলে, এখনও বুক মুচড়েই ওঠে সোমনাথের। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, কথাটা সে মিথ্যেই বলেছিল। তার জীবনের প্রথম শুভ্র মিথ্যা।

শুভ্র তো, তাই বোধহয় পরক্ষণেই একটা লোক বা ছেলে একটু পাশ হয়ে যেতে সোমনাথ দেখতে পেয়েছিল তার উদ্দেশ্যকে। না কোনও মুখ দেখতে পায়নি সে। ছোট তো। দেখেছিল টেবিলের চারটে পায়া তার মধ্যে দুটো চটি পরা পা। গানের তালে তালে মাটিতে পড়ছে। উদাত্ত, গম্ভীর অথচ মিষ্টি সুরে

¯c‡ivMx

ভেসে যাচ্ছে পৃথিবী। এই গানটা তার বাবাও করে। এইভাবেই করে। এইভাবেই, কিন্তু কত আলাদা। সে যেন আবছা বুঝতেও পারছিল। বাবার গানের চেয়ে কত ভালও! তার অবশ্য কষ্টও হচ্ছিল। তার বাবার গানের চেয়ে ভাল বলে আবছা বুঝতে পেরে। — 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি' বলার সময় 'কো' আর 'থাও' আলাদা হয়ে যাচ্ছিল। 'কো' অংশটি অল্পভাবে উচ্চারিত হয়ে 'থা-আ-ও'-টা একটু দূরে গিয়ে এমনভাবে দুলে উঠছিল, যেন— বড় হয়ে পরে ভেবেছে সোমনাথ, শৈল ঘোষালের কাছে ওই গান সামনাসামনি শুনতে শুনতেই ভেবেছে, যে মনে হচ্ছিল, ওই দেশ সত্যিই কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেবল আমার এই জন্মভূমি ছাড়া কোথাও নেই সেই জায়গা। এমনই বিশ্বাসের জোর ছিল ওই গায়নে। 'কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে।' এই অংশে এসে 'খেলে' কথাটি এমন করে ভেসে পড়ছিল সুরে, শৈল ঘোষালের গলায় বরাবরই এমনভাবে ভেসে পড়ত, যেন সত্যিই বিদ্যুৎ খেলে যেত আকাশে। সেদিনও যাচ্ছিল তাই।

কিন্তু চায়ের দোকানের লোকটি বলল, ওই তো বাহাদুর আসছে।

চায়ের দোকানি বলল, বাহাদুরদা, এরা তোমাকে খুঁজছে।

তার মানে এ যে দারোয়ান তাতে ভুল নেই।

বাবা বলল, আমরা আপনার কাছেই এসেছি। আপনিই কি এই স্কুলের দারোয়ানজি!

লোকটি একটু থতমত খেয়ে, এ হাতের বাজার ও হাতে করতে করতে বলল, হাঁ। হাঁ। ও হি তো।

বাবা বলল, নমস্তে, নমস্তে।

লোকটা হাঁ হয়ে গিয়ে বাজারটা নামাল পায়ের কাছে, নমস্তে, লেকিন...

বাবা একগাল হেসে বলল, আচ্ছা আপনাদের হেডমাস্টারমশায়ের বাড়িটা কোথায় একটু বলবেন?

—বাড়ি? কি ই লড়কাকে লিয়ে? লেকিন ভর্তিউর্তি তো সব হইয়ে গিয়েসে!

—না, না, ভর্তি নয়। অন্য দরকার। বাড়িটা কোথায় বলবেন দয়া করে?

—সি তো হোলো লাইনকে পার। লাইন সে উধার যাকে যো চিলা পাড়া হ্যায়...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যালাপাড়া। চিনি তো।

—ওহি পে আসে হিডসার কি বাড়ি।

—ব্যস ব্যস ঠিক আছে।

—লেকিন হিডস্যার তো ঘরমে নেহি থাকবেন আভি।

—সে কী। বাড়িতে পাব না!

—নেহি তো। হিডস্যার তো কালিয়ানি মে যাতে হ্যায়। সুবা সুবা। হর রোজ।

¯c‡ivMx

কল্যাণী হল মাইল তিনেক দূরে ছোট একটা গ্রাম।

বাবা বলল, চল, বাড়ি গিয়ে তো দেখি আগে।

সোমনাথ বলল, কত দূর বাবা ?

—দূর আছে রে ! চল রিকশায় উঠি।

সোমনাথের মনে আছে রিকশা দোট্টাকা চেয়েছিল। সে যুগে অনেক।

রিকশায় উঠে বাবা বলল, ভাগ্যিস তোর মা বাজারের টাকাটা দিয়েছিল। ফেরার সময় কিন্তু আমরা হেঁটে ফিরব। কেমন ?

—আচ্ছা বাবা।

রিকশায় যেতে যেতে বাবা তাকে বলল, ওই দারোয়ান কী রকম অবাক হয়ে গেল বল ?

—হ্যাঁ। কেন বাবা ?

—ওকে তো কেউ ওরকম নমস্তে টমস্তে বলে না। আমি বললাম।

—কেন বললে, বাবা ?

বাবা তাকে জগৎ বোঝাল। এই সব লোকেরা একটু ল্যাজে খেলায়। বুঝলি না।

—ল্যাজে খেলায় মানে কী বাবা ! ওর তো কোনও ল্যাজ ছিল না !

—ল্যাজ নয়। মানে, এটা একটা কথার কথা। বড় হয়ে তুইও শিখবি। ও, মানে, ওই দারোয়ানরা চট করে বলতে চায় না। বুঝলি তো। আমাকে পাত্তাই দিত না। তাই অত খাতির করে কথা বললাম। কী রকম কায়দা করলাম বল। এই রে। হেডমাস্টারমশাইয়ের নামটা তো জিগ্যেস করা হল না।

—নাম জানো না তুমি !

—না রে। যাই তো আগে।

চ্যালাপাড়ার মোড়ে রিকশা ছেড়ে দিয়ে তাকে নিয়ে বাবা দাঁড়াল একটা চা-মিষ্টির দোকানের সামনে।

—এখানে হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন।

দোকান সবে খোলা হয়েছে। সদ্য আসা দু'-চারজন খদ্দেরের হাতে চায়ের গেলাস ধরিয়ে দিতে দিতে দোকানি বলেন, কোন হেডমাস্টার ?

—কোন হেডমাস্টার ? মানে ?

চায়ের গেলাস ধরা একটা ছেলে বলল, এখানে তো দু'জন হেডমাস্টার থাকেন। আপনি কার কথা বলছেন।

—দু'জন ? বাবা জলে পড়ল।

—হ্যাঁ, কান্তি রায়, আর শৈল ঘোষাল। কাকে খুঁজছেন !'

বাবা, ভয়ানক বিব্রত হেসে বলল, মানে, হেডমাস্টারমশাইয়ের নামটা তো জানি না। তবে স্কুলটা হল নদীর ধারে। বটগাছের উল্টোদিকে। সামনে খেয়াঘাট।

¯c‡ivMx

—ও, শিব চৌধুরী ইস্কুল !

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবা পায়ের তলায় মাটি পায়। বলে, ওই কাল যেখানে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন ছিল।

—ডানদিকে সোজা চলে যান। একটু এগিয়ে চ্যালাপাড়া পোস্টাপিস পাবেন। তার উল্টোদিকের বাড়িটা।

তারা পৌঁছল। দোতলা বাড়ি। বাইরে লেটার বক্স। ইংরেজি অক্ষর। সোমনাথ সবই চেনে। কিন্তু বানান করে করে পড়তে শুরু করার আগেই বাবা পড়ে ফেলল। শো-ও-ই-লো কু-মা-র গোহ্ শাল ! এই তো !

বাবা দরজায় কড়া নাড়ল দুবার। কেউ উত্তর দিল না। তারপর ক্ষীণকণ্ঠে ডাকতে লাগল, মাস্টারমশাই। মাস্টারমশাই বাড়িতে আছেন নাকি !

হাফপ্যান্ট পরা একটা ছেলে ওপর থেকে ঝুঁকে বলল, মামা বাড়ি নেই। আর ইস্কুলে সব ভর্তি হয়ে গেছে।

বাবা হকচকিয়ে মুখ তুলে, প্রায় মিনতি করল বাচ্চা ছেলেটাকে, না না, ভর্তিটর্তির ব্যাপার নয়। অন্য দরকার ছিল। শোনো ভাই, খুব দরকার...

ছেলেটা সোমনাথের কিছু বড়। বাবাকে পাত্তাই দিল না। বলল, মামা কল্যাণী গেছে। পরে আসবেন। বলে মিলিয়ে গেল !

বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। যেন কী করবে ঠিক করতে পারছে না। তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, কলিয়ানি। বেশ তা হলে চল। ফিরে যাই।

বাবার সঙ্গে হাঁটতে লাগল সোমনাথ। বাবা বলল, ওই চায়ের দোকানটায় একটু চা খাই চল। এতটা হেঁটে ফিরতে হবে তো। তোকে বাড়িতে ছেড়ে দিয়ে তারপর বাজার যাব বুঝলি তো !

—কেন বাবা ?

—শোন না, আমি কিন্তু বাড়িতে ঢুকব না। রাস্তায় দাঁড়াব। তুই অমনি দৌড়ে বাড়ি ঢুকে যাবি। কেমন ?

—আচ্ছা। মা তোমাকে বকবে বলে, তাই !

—তা-ই তো। আরেঃ...

সোমনাথ দেখল বাবা তার হাত ছেড়ে দিয়েছে। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের সামনে একটি লোক আসছে সাইকেল করে। লোকটির পরনে হাফপ্যান্ট। চুল কাঁচা পাকা। চোখে চশমা। দুই কাঁধে দুটো বড় ফ্লাস্ক।

বাবা প্রায় দৌড়ল। মাস্টারমশাই !

লোকটি চমকে, ঈষৎ বিরক্ত মুখে সাইকেল থেকে নামল। সোমনাথ দেখল লোকটি প্রায় তার বাবার সমান লম্বা।

—মাস্টারমশাই, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল মাস্টারমশাই। লোকটি গম্ভীর মুখে বলল, কী কথা বলুন তো ? তারপর লোকটি সোমনাথের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, স্কুলে কিন্তু আর জায়গা নেই। অ্যাডমিশন বন্ধ হয়ে

¯c‡ivMx

গেছে !

—না না, স্কুলের কথা নয়। আমার এই ছেলেটার কথা। আর এই আমার কথা, মাস্টারমশাই।

ভদ্রলোক একটা শ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, শুনুন। আমি বুঝতে পারছি আপনার ছেলের একটা ভাল স্কুল দরকার। এখানে যা পাওয়া যায় তার মধ্যে ভাল স্কুল। আমি বুঝতে পারছি, আপনি খুব চেষ্টা করছেন ছেলেকে মানুষ করতে। খুব কষ্টও করছেন। এই স্কুলে ভর্তি না হলে আপনার ছেলে মানুষই হবে না, এমন ভয়ও পাচ্ছেন, যদিও আমরা জানি এটা এমন কিছু ভাল স্কুল নয়, কিন্তু আমার কিছু করার নেই। কিচ্ছুই করার নেই।

সোমনাথ ভদ্রলোকের পায়ের দিকে তাকাল। সাদা কেডস পরা। তার ওপর ঘাস আর কাদামাটি। ভদ্রলোক আবার বললেন, সকাল থেকে প্রতিদিন গার্জেনরা তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে আসেন। আর আমাদের এই সব কথা শুনতে হয়। কিন্তু আমাদের তো একটা জায়গায় থামতেই হবে। আমরা তো আর স্টুডেন্টদের মেঝেতে বা বারান্দায় বসতে দিতে পারি না...! আমাদের স্কুলের সুবিধে অসুবিধের কথা যদি আপনারা একটুও না বোঝেন...

বাবা জলে ডোবা মানুষের মতো হাঁকুপাঁকু করতে করতে কুটো আঁকড়াল। না, কুটো নয়। আজ এতদিন পরে সোমনাথের মনে হয় বাবা একটা ভেসে যাওয়া গাছ আঁকড়াল। তাকে নিয়ে উঠে পড়ল গাছটার পিঠে।

বাবা বলল, স্কুলের কথা নয় মাস্টারমশাই, স্কুলের কথা নয়। গানের কথা।

—গানের কথা ?

—হ্যাঁ মাস্টারমশাই, গানের কথা।

—আমাকে, মাঝে মাঝে একটু গান শোনাবেন মাস্টারমশাই।

—গান শোনাব ?

শৈল ঘোষাল তার প্রধানশিক্ষকতার জীবনে কোনও ছেলের হাতধরা বাবার মুখে এমন কথা নিশ্চয়ই কখনও শোনেননি। তাঁর মতো লোকও কথা খুঁজে পেলেন না যেন !

—গান শোনাব ? আমি ? আপনাকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল যে গান গাইলেন আপনি সেই গান। অমন করে গাইতে তো আজ আর তেমন কাউকে শুনি না। আমাকে যদি একটু শোনান মাঝে মাঝে। আমাকে, আর আমার এই ছেলেটাকে। মানে লেখাপড়া তো করছে সবাই যেমন করে। খেয়ে পরে বাঁচুক সেটাই চাই। কিন্তু ভাল গানও একটু শুনুক। ভাল সুর ভালভাবে একটু ঢুকুক ওর কানে।

হতভম্ব ভাবটা ভাল করে না কাটিয়েই শৈল ঘোষাল বললেন, ভাল সুর ? ভাল ভাবে ? চলুন, বাড়ির ভিতরে চলুন।

বাড়ির দিকে ওই দু'-চার পায়ের দূরত্ব পেরোতে পেরোতেই শৈল ঘোষাল জেনে নিলেন বাবার নাম কী। সোমনাথ কোথায় পড়ে তা-ও।

¯c‡ivMx

যে ঘরটায় প্রথমে কড়া নেড়েছিল তারা, ল্যাচকি দিয়ে সেই দরজা খুলে ঘরটা পেরিয়ে একটা লম্বা সিঁড়ি দিয়ে সোমনাথদের ছাদে নিয়ে এলেন শৈল ঘোষাল। ছাদের ধারে ধারে টবে ফুলগাছ আর অর্কিড। সকাল বেলার সুন্দর রোদ পড়েছে গাছগুলোয়। ছাদের ধারে একটা শেকল দেওয়া ঘর খুলে দুটো বেতের চেয়ার আর একটা মোড়া বার করলেন। সোমনাথদের বললেন, ছাদেই বসা যাক, কেমন ? ভেতরের ঘরটা বেশ বড়। পূর্বমুখী ঘরে জানলা দিয়ে রোদ পড়েছে বিছানায় আর মেঝেতে। বিছানাটা হল বেঁটে একটা খাটিয়া।

কাঁধে যে দুটো ফ্লাস্ক নিয়ে এসেছিলেন শৈল ঘোষাল, সেই ফ্লাস্ক দুটো ঘরে রাখলেন। তারপর পাশের ছোট আর একটা ঘর খুলে একটা টেবিলে রাখা প্রাইমাস স্টোভ পাম্প করতে লাগলেন।

—চা খাবেন তো !

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনারা থাকেন কোথায় ?

—থাকি আমরা মাস্টারমশাই ষষ্ঠীতলায়।

—ষষ্ঠীতলার কোথায় ? পাল চৌধুরীদের বাগানটার কাছে ?

—বাগান আর কই ! ওটা তো মজাপুকুর আর জঙ্গলে ভর্তি। ওই পুকুরের পিছনের বাড়িটা। দেখবেন, পাঁচিলটা ভাঙা মতোন...।

ইতিমধ্যে শৈল ঘোষাল কেডস আর গায়ের গেঞ্জি খুলে বড় সাদা একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে নিয়েছেন। সারা গায়ে লোম।

রং বেশ ভালরকম কালো। সোমনাথ দেখল ভদ্রলোকের গোঁফও চুলের মতোই কাঁচাপাকা। তিনি একটা হরলিকসের শিশি খুলে চারখানা সার্কাস বিস্কুট নিয়ে হাতে দিতে গেলেন সোমনাথের। সোমনাথ বাবার দিকে তাকাল। শৈল ঘোষাল গম্ভীর গলায় তাকে বললেন সব কাজ করার আগেই বাবার কথা শুনে নেওয়া ভাল, তবে, বিস্কুট খাবার আগে নয়।

বাবা খানিকটা নার্ভাস হয়ে গিয়ে তাকে বলতে লাগল, নাও, নাও, দিচ্ছেন, নিতে হয়।

সোমনাথের বাড়ানো হাতে বিস্কুট না দিয়ে শৈল ঘোষাল সোমনাথের ছোট্ট ছোট্ট দুটো বুকপকেটে দু'খানা করে বিস্কুট ভরে দিয়ে বললেন, পকেট থেকে বার করবে আর খাবে।

শৈল ঘোষাল এখন স্টোভের ওপর সসপ্যান বসিয়ে তার ওপর ডিম ভাঙছেন। ছুরি দিয়ে পাঁউরুটি কাটছেন। বললেন, গতকাল বিকেলে আপনি স্কুলে ছিলেন বুঝি ?

—হ্যাঁ। সামনে দিয়ে যেতে যেতে মাইকে ভেসে আসা সুর শুনে ঢুকে পড়েছিলাম। আমাদের একটু মাঝে মাঝে শোনাবেন তো মাস্টারমশাই ? আমাকে আর আমার এই ছেলেটাকে ?

¯c‡ivMx

—শুনুন...

—না না, শেখাতে বলছি না। জানি অত সময় করা মুশকিল। আপনি কত ব্যস্ত। কিন্তু বাড়িতে যখন গান গাইবেন, আমরা একটু আসব ? একটু বসে থাকব সামনে ! আমার ছেলের জন্যই বলছি আর কি।

শৈল ঘোষাল চায়ের জল চাপানো বন্ধ রেখে এ দিকে ঘুরলেন, ছোট ঘরটার দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে খানিকটা বিমূঢ় দেখাচ্ছে।

—শুনুন। আপনার ডিমান্ড এত কম, আর এত অদ্ভুত যে, আপনাকে কিছু বলাও যায় না। গান শেখাবার মতো গান অন্তত আমি জানি না। তার জন্য...

বাবা হাহাকার করে উঠল, এ কথা বলবেন না...

—দাঁড়ান, শেষ করতে দিন আমাকে। গান শেখাতে গেলে রেওয়াজ লাগে। আমি রেওয়াজ করি না। সময়ই পাই না। মাঝে মাঝে বসি। মাঝে মাঝে, গাইও। স্কুলের কোনও ফাংশনে। শ্রীঅরবিন্দ ভবনের কোনও কিছু হলে...গান এতে হয় না। শেখানো তো উচিতই নয়। দাঁড়ান, শেষ করতে দিন। এমন গান শোনাও বোধহয় কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে উচিত হবে না। আপনি ঠিকই ভেবেছেন, শিশুর কানে ভাল সুরই পৌঁছনো দরকার। খারাপ সুর শুনে বড় হলে কান খারাপ হয়ে যায়...

বলতে বলতে শৈল ঘোষাল ঘরে গেলেন, ডিম আর টোস্টের প্লেট তাদের হাতে হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন, কই ? বিস্কুটের কী খবর ?

সোমনাথ বলল, পকেটে।

—সে কি, এখনও পকেটে। এতক্ষণ সময় ফেলে....যাক, আগে এগুলো শেষ করো। বাড়ি ফিরে তো পড়তে বসতে হবে, তাই না ?

সোমনাথ ঘাড় হেলাল। যদিও, রবিবার সোমনাথ মোটেও পড়তে বসতে চায় না। বাবার সঙ্গে তিড়িং বিড়িং করে বেড়ায়। তার মায়ের ভাষা এটা। এবং সোমনাথ খেয়াল করল, ইতিমধ্যে বেশ অনেকক্ষণই, নীচে থেকে দু'-তিনটি বালকবালিকার পড়ার শব্দ ভেসে আসতে শুরু করেছে।

শৈল ঘোষাল দু' কাপ চা এনে নামিয়ে বললেন, আমার কাপটা একটু বড়। ছেলেকে গান শেখাতে চান তো গানের ইস্কুলে, কিংবা কোনও স্বীকৃত গাইয়ের কাছে দিচ্ছেন না কেন ? এখানে তো আছেন কেউ কেউ ! এই শহরে।

—না, মানে। শেখাব হয়তো, তবে আর একটু বড় হয়ে নিক। মানে, ব্যাপারটা হল...

বাবা চুপ করে যায়। আবার শুরু করে, আসলে আমি শোনাতে চাই। দিইও যদি গানের ইস্কুলে, অন্য কারও কাছে তো আর এইরকম গান শিখবে না। শুনবেও না। এমন গান তো আর এখানে, এই টাউনে কেউ গায় না, আপনি কাল যা গাইলেন !

—এমন গান মানে ?

—মানে, ধরুন এই ধনধান্যে পুষ্পেভরা, তারপর বঙ্গ আমার জননী

¯c‡ivMx

আমার,...

শৈল ঘোষাল হঠাৎ বললেন, আপনি স্বদেশি করতেন বুঝি ?

বাবা অবাক, না না। কেন ? স্বদেশি তো করিনি ?

—রাজনীতিও করেননি কখনও ?

—না।

—আপনাকে দেখে অবশ্য মনেও হয় না। তবে ওই দেশাত্মবোধক গান হঠাৎ শুনতে চাইছেন কেন ? শেখাতেও চাইছেন ছেলেকে। স্বদেশি গান কেউ ভালবাসে নাকি আজকাল ? এটা বেশ পিকিউলিয়ার।

—স্বদেশি গান বলে তো নয়। ভালবাসি দিলীপ রায়ের গান বলে।

এই প্রথম দিলীপ রায় নামটা কানে ঢুকল সোমনাথের।

আবার অবাক শৈল ঘোষাল, দিলীপ রায়ের গান !

—যদিও ওগুলি ডি. এল রায়ের গান, তবু, আমার কাছে ওগুলো দিলীপ রায়ের গান। তাঁর নিজেরও অনেক গান আছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন। মানে কাল যে গাইলেন আপনি, ওঁর ঢঙেই তো গাইলেন। অবশ্য ওঁর মতো কেউ হবে না।

শৈল ঘোষাল মুহূর্তে একমত হন। ঠিক। ঠিক। ওঁর মতো কেউ হবে না আর। আপনি সামনে থেকে শুনেছেন কখনও ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কয়েকবার।

শৈল ঘোষাল এবার একেবারে অন্য একটা দৃষ্টিতে তাকান বাবার দিকে। সোমনাথের মনে আছে সেই দৃষ্টি। তারপর বলেন, আপনি নিজে গান করেন, না ?

বাবা শশব্যস্ত—আজ্ঞে না। কখনও না।

শৈল ঘোষালের দৃষ্টি স্থির, হ্যাঁ করেন।

বাবা খানচুর, না না, সত্যি বলছি আমি গান করি না ! বিশ্বাস করুন !

সেই মুহূর্তে বলে উঠল সোমনাথ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। গান করে বাবা। বাড়িতে করে।

বাবা মাটিতে মিশে গিয়ে বলে, ছি ছি, সে সব কোনও গান নয় সমু, তুমি ছেলেমানুষ, বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে হয় না।

শৈল ঘোষাল বাবার মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সোমনাথের মুখে রাখলেন। মুখ গম্ভীর। গম্ভীর ঠিকই, কিন্তু আজ মনে করতে পারে সোমনাথ, চোখে হাসি ছিল।

—হ্যাঁ, বলো, কী কী গান করেন বাবা।

—বঙ্গ আমার-টা করে, যেদিন সুনিলোটা করে, ওঠ মা ওঠ মা করে, শোন সখী শোন-টাও করে। খুব ভাল গান করে আমার বাবা।

সোমনাথকে বাবা তো বকতে পারে না। হাত ধরে মিনতি করতে থাকে তাই, অমন বলতে নেই সমু। তুমি কার সামনে কী বলছ, জানো না।

¯c‡ivMx

বাবাকে কিছুমাত্র পাত্তা না দিয়ে সোমনাথ বলে, আমিও করি। বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও গান করি। কাল সারারাত করেছি। বাবার সঙ্গে।

শৈল ঘোষাল হেসে উঠলেন। সকালবেলার রোদের সঙ্গে ঝরঝর করে সেই হা হা হাসি উঠে গেল খোলা ছাদের আকাশে। সোমনাথ সেই প্রথম দেখল কোনও পুরুষমানুষের হাসি কেমন হতে পারে। অমন পুরুষমানুষও আর কখনও দ্যাখেনি সোমনাথ, তার সামান্য জীবনে।

অমন প্রবল পুরুষ আর কখনও দ্যাখেনি সোমনাথ।

তার কাছাকাছি একজনকে দেখেছে। অমিয় নাগ।

শৈল ঘোষালের মতোই, অমিয় নাগকেও ভোলার কোনও উপায় সোমনাথের নেই।

সেই হাসি হঠাৎ থামিয়ে শৈল ঘোষাল বলেছিলেন, আপনি নিজেই শেখান না কেন, ছেলেকে ?

বাবা কাতর আর হালছাড়াভাবে বলল, আমার সে সামর্থ্য নেই। আপনি কি আমাকে বিশ্বাস করছেন না মাস্টারমশাই ?

এবার লজ্জা পাবার পালা শৈল ঘোষালের, —সে কথা নয়। অবিশ্বাস করব কেন ! ভাবছি অন্য কথা। অধিকারের কথা।

—অধিকার ?

—হ্যাঁ। ওই গান, ওই ঢঙে গাইবার চেষ্টা করি হয়তো। কিন্তু তা শেখাবার, এমন কি শুনেও যদি ওই গানকে জানতে চায় কেউ, তাকে, গুরুত্ব দিয়ে শোনাবার অধিকার কি আছে আমার ! না নেই।

বাবা কুল না পেয়ে বলে, কেন এ কথা বলছেন !

—কারণ আছে, তাই বলছি। নিজে তো জানি সে সব গান কী !

—আপনি শুনেছেন ওঁকে, না ? সামনে থেকে ?

—হ্যাঁ, অনেকবার। ওঁর গান, ঠিকভাবে জানেন এমন মানুষ তো কম। অল্পই কয়েকজন আছেন, কলকাতায়। ছেলে একটু বড় হোক, পড়াশোনা করুক, তারপর ওঁদের কারও কারও কাছে যোগাযোগ করে দেখবেন।

—পারব না মাস্টারমশাই, আমার সেই সামর্থ্য নেই। বড় জায়গায় পাঠানোর কথা ভাবি না। অত সঙ্গতি...

—আরে দাঁড়ান না। এখনই খামোখা অত উতলা হচ্ছেন কেন এইটুকু ছেলের জন্য। বাড়িতে গ্রামাফোন আছে তো ! ওই এখন যাকে বলে রেকর্ড প্লেয়ার !

সোমনাথ বলে উঠল, খারাপ হয়ে গেছে। বাজে না !

আবার সোমনাথের দিকে সেইভাবে গম্ভীর তাকালেন শৈল ঘোষাল। কিন্তু চোখে হাসি।

—তাই নাকি। বাবার সঙ্গে দোকানে গিয়ে সারিয়ে আনো।

—বাবা তো সারাচ্ছে না। কত্ত দিন হয়ে গেল।

¯c‡ivMx

—কত্ত দিন ? ও বাবা !

শৈল ঘোষাল বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, সে কী মশাই, এত গান ভালবাসেন, যন্ত্রটা সারাচ্ছেন না কেন !

—সময় পাই না মাস্টারমশাই। সকাল সাতটায় ট্রেন ধরি। অফিস তো কলকাতায়। নটায় হাজিরা। ৬টা পর্যন্ত থাকতে হয়। প্রাইভেট অফিস তো। এক-একদিন সাড়ে ছটা-সাতটা হয়। বাড়ি ফিরতে নটা তো পেরিয়ে যায়। মানে, বুঝতে পারছেন, আর, মানে...

সোমনাথ বুঝেছিল পরে, সেদিন বাবা যা বলতে পারেনি, বলতে পারছিল না, সেটা হল তাদের আর্থিক অবস্থার কথা।

শৈল ঘোষাল অবশ্য বুঝে নিয়েছিলেন।

বাবা বলে চলেছিল, মানে, বড় জায়গার কথা ভাবি না। ভাল গান একটু শুনুক ছেলেটা। গান বড় সঙ্গ দেয়। দুঃখে কষ্টে, গান বড় বাঁচায়।

শৈল ঘোষাল বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর একটা শ্বাস ফেললেন, বুঝলাম। আপনি গান জানেন। কিন্তু শোনাবেন না। বেশ না শোনান। আসবেন। আমি শোনাব। ছেলেটার পড়ার ক্ষতি না হয় যেন সেটা দেখে সময় করে আসবেন। এই রকম শ্রোতা তো আর কখনও পাব না। এমন শ্রোতা যে হয়, তাই তো জানতাম না।

বাবা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে একটা ভুল করে ফেলল। সোমনাথ পরে বুঝেছিল, আচমকা একটা কমপ্লিমেন্ট পেয়ে জ্ঞান হারিয়ে বসেছিল বাবা। বলেছিল, না না, কোনও ক্ষতি হবে না পড়ার। আসব। শুনুক। শুনুক। শোনাতে শোনাতেই যদি একদিন শেখাবার মন হয় আপনার...

দপ করে জ্বলে উঠেছিল শৈল ঘোষাল, না। শেখাব না। কোনও দিন কখনও না। সে আশায় থাকলে আসতে হবে না আপনাদের...

—মাস্টারমশাই।

—কারণ, গান শেখাবার কোনও অধিকার আমার নেই। এই গান যাঁরা শেখাতে পারেন, তাঁরা সঙ্গীতকে নিজের জীবনটা দিয়েছেন। যে কোনও গান, শিখতে গেলে, শেখাতে গেলে তো বটেই, সঙ্গীতকে নিজের জীবনটা দিয়ে দিতে হয়। আমি তা দিইনি। আমি শেখাতে পারি না।

বাবা ঘেমে-নেয়ে একশা, ক্ষমা করবেন মাস্টারমশাই, আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার দোষ হয়েছে।

—দোষের কথা নয়। শৈল ঘোষাল এগিয়ে গিয়ে বাবার কাঁধে হাত রাখলেন, বললাম যে, অধিকারের কথা। সব কাজে সবার অধিকার থাকে না। অধিকার অর্জন করতে হয়। পরিশ্রম করে। ঘাম দিয়ে আর কষ্ট দিয়ে। আমরা সেটা মনে রাখি না। সমাজের কোনও কাজের ক্ষেত্রেই মনে রাখি না। যাক, ওসব...কিন্তু গান যে গায় তাকে মনে রাখতেই হয় এই অধিকারের কথা। আর হ্যাঁ, গান যে শোনে, তাকেও। নিজের অধিকারের

¯c‡ivMx

সীমাটাকে লঙ্ঘন করা উচিত নয়।

অধিকার। এই শব্দটা আজ আরেকবার নতুন করে মনে পড়ছে সোমনাথের, কলেজে, এই দুপুর সাড়ে বারোটায় অফিস ঘরে বসে। সকালে, সুবীরবাবুর কথাটা শোনার পর থেকেই মনে পড়ছে। কেউ যদি কখনও তাকে গান গাইতে বলে, প্রকাশ্যে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা মনে পড়ে তার। কলেজে, এখন কোনও প্রোগ্রাম হলেই, গানের একটা ডাক পড়ে তার। তাতে সে মরমে মরে যায়। এই ধরনের জায়গায় তার গান তেমন মানায়ও না, কিন্তু সে নিরুপায়। একটা দুটো ওইরকম যাকে বলে 'স্বদেশি' গান হারমোনিয়াম ছাড়া গেয়ে সে উঠে পালায়। আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে মার্জনা চায়। দেবী সরস্বতীর কাছে মার্জনা চায়। তার সরস্বতী অবশ্য তৃষ্ণা চৌধুরী, কিন্তু তাঁর কাছে মাপ চাইবার প্রশ্ন ওঠে না, কেন না, তৃষ্ণা চৌধুরীর রেকর্ডের কোনও গান তো সে বড় একটা গায় না ওই সব কলেজের অনুষ্ঠানে। আজকাল, কথা দিয়েও ডুব মারে। জানে, ছেলেরা পরের দিন একটু অনুযোগ করবে, উদ্বোধন সঙ্গীতটা আপনার জন্যই লেট হয়ে গেল...। কিন্তু সোমনাথ জানে, কেউ তার ওপর রাগ করতে পারে না।

অবশ্য একজন ছাড়া।

মালা।

মালার অবশ্য তার উপর রাগ করার অধিকার আছেই।

মালা তার গানের উপরও রাগ করে। গানের ওপর রাগ করার অধিকার মালার আছে কি না সেটা অবশ্য জানে না সোমনাথ। যেমন সে জানে না, প্রকাশ্যে গান গাইবার অধিকার তার আছে কি না।

তার ধারণা, নেই।

কিন্তু আবার, আবারও তাকে আর একটা ওই রকম বিচিত্রানুষ্ঠান গোছের কিছুতে গান গাইতে হবে।

তার এই সর্বনাশটা করে গেছে যাজ্ঞবল্ক্য রায়। আগে সে গাইত না। কারণ, কলেজের কেউ তেমন জানত না তার গানের কথাটা।

যাজ্ঞবল্ক্য রায় সেটা জানিয়ে দিয়ে গেছে। যাক কী আর করা যাবে। চেয়ারে শরীর টান করতে করতে দেয়ালের ঘড়িটা দেখল সোমনাথ। ফার্স্ট হাফ শেষ হতে চলল। এখুনি তুমুল ব্যস্ততা শুরু হয়ে যাবে। তার আগে একটু চা খেয়ে নেওয়া যায়।

জাফরি কাটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সোমনাথ। সুইংডোরের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায় টিচার্স রুম ফাঁকা। জানলার উল্টোদিকে বাঁ পাশ ঘেঁষে চায়ের দোকান। ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরে সোমনাথ তর্জনী তুলে 'এক' দেখাল। আর ওই 'এক' দেখানোটা দেখল, চায়ের ছেলেটা নয়। এক জোড়া চোখ। স্টিলফ্রেমে রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে, দুপুরের হাওয়ায় উড়ছে ছেলেদের মতো চুল। থুতনির নীচে আঁচিল। চোখে পড়তে না পড়তেই,

¯c‡ivMx

হঠাৎ দৃষ্টিপথে ঢুকে আসা রিকশা বাঁক নিয়ে আড়াল হয়ে গিয়ে থামল কলেজের পিছনের গেটে।

শ্বাস আটকাল সোমনাথ।

স্টেশন থেকে রিকশায় এলে, পিছনের রাস্তাটাই শটকার্ট হয়।

আর, সেকেন্ড হাফে ইনভিজিলেশন আছে নিশ্চয়ই।

৫

সন্ধেবেলা তালা খুলে ঘরে ঢুকল সোমনাথ। বাড়িতে আজ কেউ নেই। বাড়ি আজ তার অধিকারে। আজ গান গাইবার অধিকার আছে তার। বাড়িতে।

অধিকার শব্দটা খুব আশ্চর্য। লোকে বলে, ও জিনিসটা নাকি কেড়ে নিতে হয়। নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেওছে সোমনাথ যে, অন্যে এসে অধিকার কেড়ে নেয়। আর একবার নিলে, সেটা ফেরত পাওয়া শক্ত। লোকে এও বলে যে, ফেরত আনতে গেলে যুদ্ধ করতে হয়। না, যুদ্ধ-বিগ্রহ করার সাধ্য ও মন নেই সোমনাথের। সে বরং চুপ করে থাকবে, মেনে নেবে, তাতে বোধহয় ব্যাপারটা চুকেও যাবে তাড়াতাড়ি।

সব সময় অবশ্য যায় না।

স্নান করতে করতে, বাথরুমে, সোমনাথের মনে হল, 'জল বলে চল। মোর সাথে চল।' তৃষ্ণা চৌধুরীর গাওয়া এই গানটা নেই তার কাছে। রেকর্ডে বা ক্যাসেটে। শোনেওনি কখনও। তৃষ্ণা চৌধুরী কি এই গান তবে রেকর্ড করেননি? সোমনাথ শুনেছে এই গান সন্তোষ সেনগুপ্তের। রেডিওতে। কয়েকবার। ভারী মিষ্টি আর সুরভরা গলা। তবে একটু ভাঙা-ভাঙা। চর্চা করে যেতে পারলে, অনেকটা তার বাবার গলা যেমন হত।

বাবা, এমন একটা পাগল বাবা পেয়েছিল সে!

ছোটবেলায়, রাতে শোওয়ার সময় বাবার গায়ে পা তুলে ঘুমোত। রাতে বাবা কাজ থেকে ঘেমে-নেয়ে বাড়ি ফিরলে, বাবাকে জড়িয়ে বসে থাকত কিছুক্ষণ। আদর করত।

আজ এত দিন পর তার আবার বাবার মাথাটা বুকে জড়িয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। বাবা যেন তার ছেলে।

তার অবশ্য কোনও ছেলেমেয়ে নেই। তার আর মালার। কী আর করা যাবে। মালা একজনকে দত্তক নিতে চায়। মালার বোনের মেয়ে। তিনটেই মেয়ে তাদের। সেই জন্য তাদের মনে দুঃখও খুব। আশ্চর্য দুঃখ! এর মানে বুঝতে পারে না সোমনাথ। মালা বোনকে বলেছে, ছোটটাকে আমায় দিয়ে দে। তারা দিয়েও দিয়েছে প্রায়। সেই শিশুটি তাদের বাড়ি এসে প্রায়ই কয়েকদিন করে থেকে যায়। স্কুলে ছুটিছাটা হলে। কেন না, মালার বোনের

¯c‡ivMx

শ্বশুরবাড়ি কাছে। দূরত্ব বড়জোর আধঘণ্টাটাক। পরের বছর স্কুলে ভর্তির সময় এখানে পাকাপাকি নিয়ে আসা হবে তাকে। মালা সোমনাথকে জিগ্যেস করেছিল, দেখো, তোমার আবার আফশোস হবে না তো পরে।

এ কথার ছোট্ট একটা 'না' ছাড়া আর কোনও উত্তর দেয়নি সোমনাথ। দেওয়া যায় ? অমন একটি শিশু, সে নিজের না পরের তা মনে থাকে ? একটি শিশুর তো বড় দরকারও তাদের বাড়িতে। তা ছাড়া, নিজের বোনের ছেলেমেয়েকে কষ্ট করে মানুষ করতে তো একজনকে দেখেওছে সোমনাথ ! শৈল ঘোষালকে।

শৈল ঘোষালের নামটা মনে পড়তেই হাসল সোমনাথ। মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে সে তাকাল, তার রেকর্ড ক্যাসেটের ছোট কাচের আলমারিতে রাখা শৈল ঘোষালের ছবিটার দিকে। ভয়ানক গম্ভীর মুখ। কাঁচাপাকা গোঁফ। কিন্তু চোখ দুটোতে হাসি। ছবিটা নষ্ট হয়ে যেত। রেকর্ডগুলোও। কাচের আলমারিটা করিয়েছে সোমনাথ। ছবিটা বাঁধিয়েছে। বাবার আর মায়ের বড় দুটো ছবির সঙ্গে সঙ্গে। এবং এই রেকর্ড ক্যাসেট, ছবি বাঁধানো, এমনকি কাচ-লাগানো বুককেস কাম আলমারি সবই নিজের উপার্জনে করেছে সোমনাথ। মালার কাছে হাত পাতেনি। সংসার তো মালাই চালায়। মালার উপার্জন তার চেয়ে অনেক বেশি।

সোমনাথ টাকা একটা দেয় সংসারে। একটা মানে তার মাইনের প্রায় সবটা। কিন্তু পারতপক্ষে চায় না কিছু। একটা দুটো খুচরো টিউশনি সে রেখেছে। ছাড়েনি, মালার আপত্তি সত্ত্বেও। গান যে পছন্দ করে না, তার কাছে, গানের জিনিসপত্রের জন্য টাকাপয়সা চাইতে বাধে সোমনাথের। মনে হয় অন্যায় চাপানো হচ্ছে।

শৈল ঘোষালের ছবিটা কাচ সরিয়ে বার করে তোয়ালে দিয়ে মুছে আবার রেখে দিল সে।

শেখাবেন না বলেছিলেন, শেখানওনি। কিন্তু মাঝে মাঝে ? শিখিয়ে ফেলতেন। নিজের অজান্তে। এখন অবাক লাগে ভাবতে।

যেদিন বাবা সোমনাথকে নিয়ে শৈল ঘোষালের বাড়ি প্রথম যায়। সেদিন ফিরে আসার সময় শৈল ঘোষাল বলেছিলেন তাদের পরের রবিবার আসতে। সকাল দশটায়। সাতটা দিন দম চেপে কাটানোর পর পরের রবিবার আসতেই সকাল থেকে বাবা ছেলের সাজ সাজ রব। আজ রোববার হলেও ছেলে আগে আগে পড়তে বসে গেছে। পড়ে নিচ্ছে জিগ্যেস করলে যাতে বলতে পারা যায় 'হ্যাঁ। পড়াশুনো করেই তবে এসেছি। বাবা কাচানো ধুতি-শার্ট পরছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। তার আগে দাড়ি কামানো হল। মা এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে যেতে বলছে, অভিসারে যাচ্ছে যেন। ছেলেকে নিয়ে।

সোমনাথ বলল, অভিসার মানে কী বাবা ?

বাবা বিষম খেল, ওই, ওই আর কি ! অভিসার মানে হল, এই ধরো,

¯c‡ivMx

যাওয়া। মানে, যাচ্ছে। আমরা যে যাচ্ছি। এই সেটাই!

—তা হলে অভিসার বলল কেন মা? অন্য দিন তো বলে বাজারে যাচ্ছে তোর বাবা। বল না, অভিসার মানে কী?

বাবা আরও হতভম্ব হয়ে বলল, অভিসার মানে এমন কিছু না, এই অভিযান। মানে অভিযানে যাওয়া যাকে বলে আর কি!

—অভিযানে যাওয়া মানে কী?

বাবার অবস্থা তখন বেশ খারাপই ছিল। বলল, যুদ্ধে যাওয়া। যুদ্ধ...টুদ্ধ...করতে যাওয়া আর কি.... বুঝলি না!

—আমরা কি যুদ্ধে যাচ্ছি? মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে?

এতক্ষণ পর মা আর পারল না নিশ্চয়ই। নইলে, দরজায় পিঠ দিয়ে, হঠাৎ হাসিতে ভেঙে পড়বে কেন, উঃ বাবা...আর পারি না তোমাদের দুটোকে নিয়ে...বলতে বলতে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে চোখ পাকিয়ে বলবেই বা কেন সোমনাথকে, বড়দের কথার মধ্যে আবার কথা। পড়ো মন দিয়ে!

ঠিক এই সময়, সেই সকাল নটায়। দরজায় কড়া নড়ল। যদিও সদর দরজা খোলাই ছিল। দুধওলা কিংবা কয়লাওলার চেনা কড়া নাড়া নয়। বাবা মালকোঁচা মারতে মারতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, একী!

মা বলল, কী হল, কে?

দেখা গেল, দরজার সামনে সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে শৈল মাস্টারমশাই!

—আপনাদের আসতে বলেছি, কিন্তু আজ সকাল থেকে পাড়ার এমন অবস্থা...এই সাইকেলটা কোথায় রাখি?

—ওখানেই রাখুন, ওখানেই...কিছু হবে না।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন শৈল ঘোষাল, আজ সকাল থেকে, ওই পোস্টাপিসের সামনে, একটা মাইক চলছে। সন্ধেবেলা বিচিত্রানুষ্ঠান। আপনারা অত কষ্ট করে যাবেন। গান তো শোনাতে পারব না। অত আওয়াজের মধ্যে। তাই নিজেই...

বাবা কী করবে ঠিক করতে পারছে না। ঠিক করেছেন, কী সৌভাগ্য, ঠিক করেছেন। চিনতে অসুবিধা হয়নি তো?

শৈল ঘোষাল বললেন, কিছুমাত্র না। তারপর নিজেই মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে এক কাপ চা খাওয়ান মা। আমার এককাপ কিন্তু আসলে দু' কাপ, কেমন! সোমনাথের মনে পড়ল, সেদিন শৈল ঘোষালের হাতের কাপটা প্রায় তার চান করার ছোট মগটার মতন বড় ছিল। পরবর্তীকালে, এত চা খাওয়ার অভ্যেসটা সোমনাথ পেয়েছে বোধহয় শৈল ঘোষালের কাছ থেকেই।

শৈল ঘোষাল বললেন, দুপুরে আপনার হাতে দুটো খেয়েও যাব মা। কেমন?

মা কোনও কথা বলতে পারল না।

বাবা কোনও কথা বলতে পারল না।

¯c‡ivMx

বাড়িটা এক মুহূর্তে স্বর্গ হয়ে গেল।

নীরবতা ভেঙে সোমনাথ জিগ্যেস করল তার বাবাকে, আজ তা হলে আর অভিসারে যাব না বুঝি ?

শৈল ঘোষাল কাঁধের ফ্লাস্ক খুলে জল খাচ্ছিলেন কাপে ঢেলে। বিষম খেতে গিয়েও সামলে নিলেন, খিঃ কিসে যাবে না !

—অভিসারে।

—অভিসারে ? কোথায়।

—আপনার বাড়িতে।

—আমার...বাড়ি... ?

—হ্যাঁ। আমি আর বাবা যে যাচ্ছিলাম। অভিসারে। মা বলল।

মা এক মুহূর্তে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শৈল ঘোষাল খুব গম্ভীরভাবে, প্রায় এই ছবিটার মতো ভঙ্গিতে তাকালেন তার দিকে, অভিসারে যাওয়া কী জানো ?

—হ্যাঁ !

—বল তো কী !

—যুদ্ধে যাওয়া। বাবা বলল।

বাবা তো আর ছুটে পালাতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত মোচড়াতে লাগল, ...ইয়ে, ...মানে ছেলেমানুষ তো...বড্ড ছেলেমানুষ...বড্ড...

শৈল ঘোষাল বাবার দিকে না তাকিয়ে তাকেই বললেন, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ?

—আপনার বাড়ি।

—আমার বাড়ি কেন যাচ্ছিলে ? দাঁড়াও তার আগে বল তো আমায় আপনি বলছ কেন !

—বাড়িতে কোনও ভদ্রলোক এলে তো তাঁকে আপনি বলতে হয়।

—বেশ বেশ। এবার বল তো কেন যাচ্ছিলে ?

—গান শুনতে যাচ্ছিলাম।

—তা হলে, কী দাঁড়াল ?

—তা হলে অভিসারে যাওয়া মানে কি গান শুনতে যাওয়া ?

—সেইরকমই। এখনও পর্যন্ত সেইরকমই। বাঃ বুদ্ধিমান ছেলে।

বাবা আবার হাত নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। বলল, ছেলেমানুষ তো... মানে... বড্ড ছেলেমানুষ...

সোমনাথ বাবার দিকে মুখ তুলে বলল, ও বাবা, গান শুনব না ?

বাবা তাকে প্রবোধ দেয়, শুনব, শুনব। উনি শোনাবেন। একটু বিশ্রাম করতে দাও।

—আর কতক্ষণ বিশ্রাম করবেন ! বিশ্রাম হয়নি ?

—নাঃ আর বিশ্রাম করব না। বিশ্রাম হয়ে গেছে। এবার শোনাব। কিন্তু

¯c‡ivMx

তার আগে তোমাকে শোনাতে হবে।

—কী ?

—গান।

সোমনাথ বাবার মুখের দিকে তাকায়।

বাবা বলে, ছেলেমানুষ তো... মানে... বড্ডই...

শৈল ঘোষাল আবারও বাবার কথা যেন শুনলেনই না। তাকে বললেন, তোমার গান না শুনলে আমি কিন্তু শোনাব না। ছোটরা আগে খায়। ছোটরা আগে শুয়ে পড়ে। পড়ে কি না ?

—হ্যাঁ।

—তেমনি ছোটরা আগে গানও করে।

সোমনাথ আবার বাবার দিকে মুখ তুলল। বাবা বলল, করো। উনি বলছেন। করতে হয়।

সোমনাথ একটুও দ্বিধা না করে গেয়ে উঠল

শোন সখী শোন বলি আজ তোরে
কেমনে পাইনু মোহনে
মুনি ঋষি যার ধ্যানে অচেতন
কেমনে পাইনু সে ধনে

এই দু' লাইন গেয়েই থেমে গেল সে।

—কী হল ?

—আর জানি না।

—করো, ওই দু' লাইনই করো। ফিরে ফিরে করো।

সোমনাথ ফের শুরু করল। সোমনাথ তার তীক্ষ্ণ, মিষ্টি, শিশুকণ্ঠে গাইছে। আর শৈল ঘোষাল তাকিয়ে আছেন তার দিকে। যেন গান শুনছেন না। পড়া ধরছেন। চোখ দুটো চিকচিক করছে শুধু।

গাইতে গাইতে একবার যেই 'কেমনে পাইনু সে ধনে' পর্যন্ত বলেছে সোমনাথ, হঠাৎ কেমন একটা গুঞ্জন শুনল সোমনাথ। উ ম্ ম্ ম্...। গুঞ্জনটা রয়েই গেল। ততক্ষণে প্রথম লাইনের শেষে, কেমনে পাইনু মোহনে পর্যন্ত পৌঁছতেই শৈল ঘোষাল ধরলেন, মম মোহনে, ওগো মোহনে, সেই মোহনে...

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেরাতে লাগলেন শব্দটা। তারপর আবার শোন সখী শোন বলি আজ তোরে, শোন সখী শোন্-ন্-ন্-ন্... সোমনাথের মনে হল সারা ঘরে ঝন্ন্ উঠে পাক খেতে লাগল, ঘুরে জানলা দিয়ে উড়ে গেল বাইরে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল তার। বাবা হায় হায় করে উঠল, ঝরঝর করে জল পড়ছে চোখে। শৈল ঘোষাল, তখন অস্থায়ী শেষ করছেন, সে ধনে, ও গো সে ধনে, প্রিয় সে ধনে মনোমোহনে, মনোমোহনে।

বলতে বলতে গান নিচু হয়ে নেমে এল। সোমনাথের গাওয়া দু' লাইনের বেশি একটুও গাননি। সুর ধরে আছেন নিচু গলায়। সেই গুঞ্জন ঘুরে

¯c‡ivMx

বেড়াচ্ছে ঘরে।

সোমনাথ বড় হয়ে ভেবেছে, ঠিক যেভাবে কোনও সানাই বা সারেঙ্গি সুর ধরে রাখে সেদিন সেই ভাবে সুরকে ধরে রেখেছিলেন শৈল ঘোষাল, শুরুও করেছিলেন আবার, মনোমোহন...ইয়ে মনোমোহন... মনোমোহন আওয়ে,

লচকলচক বিজুরি ঝলক মনোমোহনা আওয়ে সুরসোহন চিতনোভন বাঁশরী বাজাওয়ে।

বাবা ঝরঝর করে কাঁদছে। মা চায়ের কাপ সামনে নিয়ে চুপ করে বসে আছে মাটিতে। শৈল ঘোষাল গেয়ে চলেছেন।

মনোমোহন এবং আওয়ে এই দুটো কথা নিয়ে খেলছিলেন শৈল ঘোষাল। খেলছিলেন, বিজুরি ঝলক নিয়েও।

পরে, বড় হয়ে এই গান শুনতে শুনতে ভেবেছে সোমনাথ। এই গান ভাবতে ভাবতে বুঝেছে সোমনাথ, মনোমোহন এবং তার আসার যে কত রূপ হতে পারে, কত রং হতে পারে তার। বিজুরি যে কত ভাবে ঝরে যেতে পারে! জীবন তার সামান্য দু'-এক ঝলক দেখায় নিশ্চয়ই। কিন্তু তার বেশিটা ধরা থাকে গানের মধ্যেই!

সোমনাথ আজ গান শুনবে। বাড়ি তার অধিকারে আছে বলেই শুনবে। তৃষ্ণা চৌধুরীরই গান। তবে একটু বিশেষভাবে শুনবে সে। তার আগে রান্নাঘরে গিয়ে প্রেসারে খানিকটা চাল ধুয়ে গ্যাসে চাপিয়ে তরকারির ঝুড়ি খুঁজল সে। কিছু নেই। আজ তো বাজারে যায়নি। আরে কালও তো যায়নি। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে এক কেজি আলু আর ডিম নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে সে। ভাতে ভাত হয়ে যাবে।

শৈল ঘোষাল তাকে বলেছিলেন, রান্না শিখে নেবে। পুরুষকে ঘরের সব কাজ শিখে রাখতে হয়। ওটা মহিলাদেরই একচেটিয়া ভাবাটা ভুল। ওসব কাজ জানা থাকলে অনেক স্বাধীন থাকা যায়।

সে রান্না শিখেছিল। ঘরের কাজ শিখেছিল। কিন্তু সে যে কী কষ্টের মধ্যে দিয়ে শেখা! তার মনে পড়ে, মা বিছানায় শুয়ে থাকার সেই দিনগুলো। বাবার চুপ করে তাকিয়ে থাকার সেই দিনগুলো। তাদের পুরনো সেই বাড়িতে, গান চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবার সেই দিনগুলো। যতদিন না মা যায়। মা চলে যাবার পরও অবশ্য গান ফিরে আসেনি, তাদের সেই বাড়িতে।

গ্যাসটা কমা-বাড়া করে দিতে দিতে ভাবল সোমনাথ মা যখন ছিল, তখন গ্যাসের চল হয়নি। এই ছোট শহরে আসেনি তখনও গ্যাসের ডিলাররা। উনুন জ্বালিয়েই সব করতে হত মাকে। কী সহ্যই না করেছে। বাবা তো কিছু জানত না।

গ্যাস তো তারা ব্যবহার করে তার বিয়ের পর। সে সব দিনে মা উঠতে পারত না, শুয়ে শুয়ে ডিরেকশন দিত। কী করতে হবে। না বলে শান্তি পেত না। তারপর একসময় কথা বন্ধ হয়ে যাবার পর, চোখ দপদপ করত শুধু।

¯c‡ivMx

যন্ত্রণাটা থাকত ২৪ ঘণ্টাই। মা-র চোখ দেখেই বোঝা যেত। বাবা, খাটের পাশে বসে মাথায় হাত বুলোত আর, মাঝে মাঝে খুব নরম স্বরে বলত, আজ খুব ভাল করে খেয়েছি, ডাল আর ভাত আর কীসের তরকারি যেন রে সমু ?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে বলত বাবা, চলে যাও, এবার চলে যাও মণিকা, আর আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না। এবার চলে যাও। আমি আর সমু ঠিক চালিয়ে নেব। কোনও কষ্ট হবে না। তুমি চলে যাও। একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলত বাবা।

ছিঃ। এই ফাঁকা বাড়িতে এসব কী উল্টোপাল্টা স্মৃতিচারণ করছে সে! আজ সে গান শুনবে না ? গান ? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তৃষ্ণা চৌধুরীর গান। অন্তত দুটো গান একটু বিশেষভাবে শুনবে সে। একটা, তৃষ্ণা চৌধুরীর বিখ্যাত—'মলয় আসিয়া কয়ে গেছে কানে।' অন্যটা 'সে কেন দেখা দিল রে।' সোমনাথের নিজের কাছে মলয় আসিয়া আছে, তৃষ্ণা চৌধুরীরই, অনেক বছর আগে বেরোন একটা ডি.এল রায়ের এল.পি-তে। অনেক ক্যাসেটের মধ্যে আছে একটা ক্যাসেটও যাতে, 'সে কেন দেখা দিল রে' আছে। একই সময়ের গাওয়া। ১৫-২০ বছর আগের। আর সম্প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য রায় তাকে উপহার দিল তৃষ্ণা চৌধুরীর নতুন একগুচ্ছ ক্যাসেটের একটা অ্যালবাম। অলটাইম গ্রেটস। শুনতে গিয়ে দ্যাখে, অনেক অন্যরকম গলাটা। এই ধরনের গলায় একটা গান অবশ্য সে শুনেছে, শ্রাবন ঝুলাতে, কিন্তু এই দুটো তো শোনেনি। ক্যাসেটকভারের পিছনে সে দ্যাখে, গানের পাশে সাল লেখা। ওই গানদুটোর পাশে লেখা ১৯৫৭। তার মানে, তৃষ্ণা চৌধুরীর তখন ২২ বছর বয়স। সোমনাথকে শৈল ঘোষাল তৃষ্ণা চৌধুরীর যে রেকর্ড শুনিয়েছিলেন, তাও ওই প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। যেখানে, এই ৫৭ সালের গানটা ছিল না। শৈল ঘোষাল বলেছিলেন, এর অনেক রেকর্ড আছে আরও। কিন্তু কেনা হয় না। হয়ে ওঠে না আমার। কমিটমেন্ট আগে। তারপর তো গান। তাই না, সমু!

বাবার মতোই, সোমনাথকে, সমুই বলতেন শৈল ঘোষাল।

কমিটমেন্ট। এই শব্দটা শৈল ঘোষালকে আজীবন ব্যস্ত রেখেছে। আজ বুঝতে পারে সোমনাথ, কমিটমেন্ট এই শব্দটা শৈল ঘোষালকে গানের দিকে যেতে দেয়নি।

আর সোমনাথকে গানের দিকে যেতে আটকায়, অধিকার শব্দটা। নানা দিক থেকে আটকায়।

আজ অবশ্য বাড়ি ফাঁকা। আজ সে গানের দিকে যাবে। রান্না চাপিয়ে দিয়ে গানের দিকে গেলও সে। ক্যাসেটে চালাল, সে কেন দেখা দিল রে। এটা তৃষ্ণা চৌধুরীর পরিণত বয়সের গলা। এটাই আগে শুনে নেবে। ৫৭ সালের গাওয়া পরে শুনবে সে। মিলিয়ে মিলিয়ে শুনবে। গান চলেছে, 'যেন কোন মায়া সরসী ছুঁতে না ছুঁতে মিলালো ও ও ও...।'

¯c‡ivMx

সঞ্চারীতে পৌঁছল গান : যেন কোন মোহন বাঁশি। যেন কোন মোহন বাঁশি রে...সুমধুর জোছনা নিশি, বাজিতে না বাজিতে যে কোথা যে গেল রে মিশি...

এই জায়গায় শৈল ঘোষাল এমনইভাবে খেলতেন। গান চলেছে, প্রভাত আলোরই সনে মিলালো যেন সে আলো ও ও ও... মুহূর্তে সোমনাথ দেখল, একটা রিকশা তার সামনে দিয়ে দ্রুত বাঁক নিয়ে আড়াল হয়ে যাচ্ছে। রিকশায় সেই একজন।

বড় বড় চোখ।

নতুন ম্যাডাম।

যার নামটা সে মাত্র আজই শুনেছে।

এমন হচ্ছে কেন ?

সে রিওয়াইন্ড করে গানটা প্রথমে নিয়ে আসতে লাগল। আরেকবার চালিয়ে দেখা যাক তো এই ছবিটা আসে কি না।

দ্বিতীয় বার সে প্রথম থেকেই চোখ বন্ধ করে রইল। এসে পড়ল, ছুঁতে না ছুঁতে মিলালো...ঠিক তাই। এবারও। আবার সেই চোখ দুটো। স্টিল চশমার পিছনে। ভেসে উঠেই মুছে গেল।

ভারী অদ্ভুত ব্যাপার। আচ্ছা আরেকবার দেখি তো। নতুন ম্যাডামকে দেখা যায় কি না। নেশায় পেয়ে বসল সোমনাথকে।

তৃতীয় বার গান শুরু হল। সঞ্চারীতে আসতেই সোমনাথ দেখল সেই আবহাওয়াটা যেন তৈরি হচ্ছে ভেতরে। সে সমস্ত মন একমুখী করে গানের দিকে উঠে গেল। আর হঠাৎ, গঁক করে একটা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল গান। সোমনাথ চোখ খুলে দেখে ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিক চলে গেছে। বিশ্বাস করতে যেন কষ্ট হল সোমনাথের। সে ধীরে উঠে সুইচ বন্ধ করল রেকর্ডারের। মাঝে মাঝেই এমন হয় এখানে। আবার চট করে এসেও যায় অনেক সময়। যদি আসে। অপেক্ষা করতে লাগল সোমনাথ।

অপেক্ষা করতে করতেই দেখল, বারান্দা থেকে গুঞ্জন ঢুকে পড়ল অন্ধকার ঘরে।

সোমনাথ গুঞ্জনকে বলল তুমি এসেছ ? এসো আমরা দুজনে চেষ্টা করে দেখি ছবিটা আসে কি না।

—সুর যদি লাগে তবে আসবেই।

মনোমোহন আওয়ে। মনোমোহন কি আসে ? আওয়ে...মনোমোহন নিয়ে কীভাবে খেলতেন শৈল ঘোষাল ! এই ছবিটাও তাকে নিয়ে কি সেইভাবে খেলতে শুরু করল ?

—এসো আমার সঙ্গে গলা দাও, গুঞ্জন ডাকল সোমনাথকে।

সঞ্চারী থেকে শুরু করল সোমনাথ, যেন কোন মোহন বাঁশি, যেন কোন মোহন বাঁশি রে...সুমধুর জোছনা নিশি, বাজিতে না বাজিতে যে বাজিতে না-আ

¯c‡ivMx

বাজিতে যে...

অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে, দু' হাত ছড়িয়ে মনোমোহনকে ডাকতে লাগল সোমনাথ। সঙ্গীত কল্পনা করতে লাগল।

যদি আসে... যদি আসে... দেখা দেয়, যদি...

তার চোখে আলো পড়ল। গান থামিয়ে তাকাল সোমনাথ। না, কারেন্ট আসেনি। নীচের মেয়েটি। দরজায় দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা বড় মোমবাতি। মোমবাতির পিছন থেকে চেয়ে আছে তার দিকে।

—আপনি অন্ধকারে গান গাইছিলেন কাকু, তাই ভাবলাম আলো নিয়ে যাই।

সোমনাথ উঠে দাঁড়াল। অ্যাঁ, হ্যাঁ! মোমবাতি তো আছে ঘরে। মানে জ্বালাইনি। দেখি কোথায় যে সেগুলো ...

—এক্ষুনি খুঁজতে হবে না। আমি এটা রেখে দিচ্ছি। আপনি গান থামাবেন না।

—গান ?

—হ্যাঁ, গান শুনব বলেই তো এলাম।

—গান, মানে ? ওই আর কি...একা একা তো... ঠিক এই সময় ভেতর থেকে প্রেসারকুকারের সিটি পাওয়া গেল। এতক্ষণ গান চলছিল। তাই শুনতে পায়নি বোধহয়। সোমনাথ ছুটল অন্ধকারের মধ্যে, পিছন পিছন মোম ধরে মেয়েটি।

সোমনাথ গ্যাস বন্ধ করে বলল, ভাতটা বোধহয় ধরে গেল একেবারে। মেয়েটি, আলো হাতে, সোমনাথকে প্রায় সরিয়ে দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। একটা খুন্তি পেড়ে খোঁচাল... পুড়ে যায়নি। সেটাই ভাগ্য বলতে হবে।

সোমনাথ মোম খুঁজে পেল একটা। মেয়েটি বলল, দিন, ধরিয়ে দিচ্ছি, তারপর রান্নাঘর থেকে দু' হাতে দুটো জ্বলন্ত মোম নিয়ে বেরনো মেয়েটিকে অনুসরণ করল সোমনাথ। মেয়েটি, মাঝের ঘরের খাবার টেবিলে একটা বাতি বসিয়ে দিয়ে সোমনাথের দিকে ঘুরে বলল, এটা কোথায় রাখব ? এটা আমার মোমবাতি। গানের ঘরে রাখি!

—গানের ঘর ?

—হ্যাঁ, ওই ঘরটাতেই তো সকালে গান করছিলেন আপনি। এখনও করছিলেন। আর আপনি যখন থাকেন না কাকিমার কাছে আমি তো আসি। তখন দেখেছি। কত ক্যাসেট। রেকর্ড! ওটা তো গানের ঘরই, তাই না!

মেয়েটি চেয়ে আছে। সোমনাথ দেখল মোমবাতির পিছনে মেয়েটির মুখ, আরও একটি মোমবাতি হয়ে জ্বলছে। দপদপে মুখ।

—আচ্ছা আপনার ঘরে হারমোনিয়ম তানপুরো এসব নেই কেন ?

—আমি তো বাজাতে জানি না।

—যাঃ বাজে কথা। এত ভাল গান করেন, উঃ...

¯c‡ivMx

—কী হল ?

মেয়েটির হাতে গলন্ত মোম পড়েছে। সোমনাথ ব্যস্ত হল এ কী ! তুমি ওটা রাখোনি কেন ! ধরে রাখলে ওভাবে তো হাতে পড়বেই, দ্যাখো তো।

মেয়েটি ঠোঁট ওল্টালো, কী আর হয়েছে হাতে পড়লে ! মোমদানটা পাচ্ছি না তাই ধরে আছি।

—দাও, এই জানলাটার পাশে রাখি...

—না না আমিই রাখছি।

মেয়েটি মোমবাতি বসাতে লাগল। সোমনাথের মনে হল মেয়েটির হাত একটি মোমদান।

মেয়েটি বলল, আমি খুব গান ভালবাসি। আমাকে কিন্তু শেখাতে হবে আপনাকে !

—মানে ?

—আপনার কাছে শিখব আমি। আমি ঠিক করে ফেলেছি। বলেওছি মাকে।

মেয়েটি বেশ দৃঢ়চেতা। নিজেই সব ঠিক করেছে। কী করে যে এমন হয় !

সোমনাথ ধীরে ধীরে বলে, বললাম যে সকালে, গান আমি জানি না। শেখানোর মতো গান তো জানিই না।

—যা জানেন অনেক। যা জানেন আমাকে তাই শেখাতে হবে।

ধৈর্য ধরে বোঝায় সোমনাথ, শোনো, তুমি ছেলেমানুষ, তুমি তো জানো না। গান শিখতে গেলে সত্যিকার গাইয়ের কাছে যেতে হয়। নইলে ভুল শেখা হয়ে যায়। আমার মতো লোকের শেখানোর অধিকার নেই।

—বেশ, তবে শোনান। শোনাবেন তো ! শোনানোর অধিকার তো আছে ?

আশ্চর্য, এইটুকু মেয়ে, কথা বলে কেমন ! মেয়েটির চোখ টলটল করছে কাঁপা কাঁপা মোমের আলোয়।

—নিন, করুন। যে গানটা করছিলেন, নীচে থেকে শুনছিলাম। ওটাই শুনব।

যেন দাবি। অথচ মাত্র আজ সকালে আলাপ। নাকি তার আগে ? মনে পড়ছে না সোমনাথের।

কিন্তু শোনানোর অধিকারও কি আছে সোমনাথের ? এই আধো অন্ধকার ঘরে। একটি মেয়েকে একা গান শোনানোর অধিকার ? যদিও মেয়েটি তার থেকে এত ছোট !

সোমনাথ বলল, তারপর, তোমার পড়াশুনো কেমন চলছে। কলেজে ?

মেয়েটি দু'-এক পলক সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেই হাসিতে ভেঙে পড়ল। ...

¯c‡ivMx

কী রে বাবা। কী বেয়াদপ মেয়ে।

—এ কী ? হাসছ কেন ?

মেয়েটি, কষ্ট করে হাসি থামিয়ে বলল, আপনার মুখে ওই কথাটা শুনে। পড়াশুনো। বাবা যখন বলে তখন ঠিক-ঠিকই লাগে। কিন্তু আপনার মুখে মানাল না। একদম মানাল না কথাটা।

—মানে ?

—মানে গান শেখাতে চান না বলে দিয়েছেন, ব্যস। অত কষ্ট করে গম্ভীর হবার কী দরকার !

এবার মেয়েটিই গম্ভীর হয়ে গেছে। আর সোমনাথ পড়েছে মহা আতান্তরে। মেয়েরা কি সমস্তই ধরতে পেরে যায় ! কী করে পারে ?

সোমনাথ কথা হাতড়ায়। মানে, শোনো, এখন তো, পড়াশোনার চাপ, মানে... তোমাদের...

সোমনাথ দু'-একটা টিউশনি করে বটে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের সেভাবে বকতে পারে না। আর এখনকার ছেলেমেয়েরা বাবা-মার কাছ থেকেই শুনে শুনে এমন টেনশনে থাকে যে, অমনোযোগী হবার কথা ভাবতেও পারে না। ফলে বকাঝকা করবার দরকার হয় না আর। তাদের সময়ের মতো।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। তার মুখ থমথমে, আমি যাচ্ছি।

—আরে শোনো।

—আপনাকে ডিসটার্ব করলাম। আপনার কাছে গান শুনতে চাওয়া আমার অন্যায় হয়েছে।

বলে চলে গেল ঘর থেকে।

সোমনাথ চুপ করে বসে রইল।

কী বলবে ? এত দ্রুত রৌদ্রছায়া বদল হল মেয়েটির ! সে যে গম্ভীর হতে পারে না, সারাক্ষণ চুপ করে থাকলেও—এত তাড়াতাড়ি সেটা কী করে বুঝে গেল মেয়েটি। আর তার উপর এমন জোরই বা এল কী করে।

আলো এসে গেল। উঠে ফুঁ দিয়ে মোম নেভালো সে, মেয়েটির রেখে যাওয়া মোম। আশ্চর্য। মেয়েটির নামটাও মনে নেই তার।

নাঃ। আর গান শুনতে ইচ্ছে করছে না। খাওয়ার পাটটা সেরে ফেলে শুয়ে পড়লে হয়। এরকম পরিস্থিতিতে শৈল ঘোষাল কখনও পড়েছিলেন কী ? পড়ে থাকলে, কীরকম আচরণ করেছেন ? সামলাতে পেরেছেন তো সবটা ? কীভাবে !

কোনও দিন জিগ্যেস করা হয়নি। জিগ্যেস করা যেতও না।

দরজার বাইরে মৃদু পদশব্দ পাওয়া গেল।

—কে।

—এই যে, আমি দাদা !

¯c‡ivMx

নীচের মহিলা। মেয়েটির মা। হাতে একটা থালায় দুটো ছোট ছোট বাটি। প্লেট দিয়ে ঢাকা দেওয়া।

—রুমা গিয়ে বলল যে, আপনি নাকি সেদ্ধ ভাত খাচ্ছেন রাতে, আর তাও নাকি পুড়ে গেছে... আমরা তো রাতে রুটি খাই... একটু তরকারি আনলাম...

—আরে না, না, সে কিছু না। ভাত ঠিকই আছে। এসব কেন...

—অবশ্য নিরামিষ। এঁচোড়ের একটা। ওটা লাউ!

সোমনাথ কী বলবে বুঝতে পারে না, আচ্ছা কী দরকার ছিল বলুন তো। ভাত মোটেই পুড়ে যায়নি...

—রুমা বলল যে, কাকু অত বোঝেন না। আপনি রুটি খান কি না জানি না তো, ভাত আবার বসিয়ে দিলে...

—না, না, কিছুই হয়নি ভাতের, ঠিক আছে। আপনি, আবার কষ্ট করে...

—তাতে কী হয়েছে। এক বাড়িতে তো আছি...আচ্ছা, আমি যাই, নীচের দরজাটাও এবার দিয়ে দিন দাদা, রাত হচ্ছে তো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন।

—থালাবাটিগুলো রইল। রুমা পরে এসে একসময় নিয়ে যাবেখন।

ঘোমটা একটু টেনে নিয়ে নীচে নেমে গেলেন মহিলা।

রুমা। মেয়েটির নাম তা হলে রুমা।

রুমক ঝুমক রুম ঝুম, নুপুর বাজে।

গাইতেন শৈল ঘোষাল। এইভাবে, রুমাকা ঝুমাকা রুমা...ঝুম্। উচ্চারণ করার সময় আ-কারগুলো এমনভাবে ফেলতেন ঠিক। 'আ'-ও নয়, আবার 'অ'-ও নয়। শেষের ঝুম্—একটা হসন্ত থাকতই কিন্তু। ঝুম্। যেন সত্যিই ঝুম্ করে মাটিস্পর্শে বেজে উঠল নূপুর! শৈল ঘোষাল পারতেন। কিন্তু এইরকম একটি মেয়ের সামনে পড়লে কী করতেন শৈল ঘোষাল। এমন নাম-না-জানা মেয়ের সামনে। এখন অবশ্য নামটা জানে সোমনাথ।

আজ সে আরও একজনের নাম জেনেছে। নতুন ম্যাডামের। একমাসও হয়নি, এত নতুন এই ম্যাডাম। সুবীরবাবুদের ইংরেজিতে এসেছেন। পার্ট টাইম। হপ্তায় দু' দিন। আজ বিলটা করতে গিয়ে নামটা ফের চোখে পড়ল। শ্যামশ্রী। শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি।

৬

মাইনের বিল করা ছাড়াও আরও একবার নামটা কানে এসেছে সোমনাথের। বিকেলের দিকে। সুবীরবাবুর মুখ থেকে। সুবীরবাবুদের ওই একসঙ্গে হওয়ার ব্যাপারটা ঘটছে আগামিকাল। যাকে বলে গেটটুগেদার।

¯c‡ivMx

আজ বিকেলে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। আসলে আমাদের নতুন যে মেয়েটি এসেছে, শ্যামশ্রী, ও খুবই উৎসাহী আমাদের সবাইকে নিয়ে কিছু একটা করতে। অন্য অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকেও কিছু কিছু ইনভলব করতে পেরেছি, বললেন তিনি। তুমি এসো কিন্তু সোমনাথ।

সোমনাথ যাবে। চাকরি করে একসঙ্গে। না গেলে খারাপ দেখায়। গিয়ে, অর্ধেক জানা গান অর্ধেক শিক্ষিত ভঙ্গিতে গেয়ে দিয়ে চলে আসবে।

এইরকম অবস্থায়, মঞ্চে বসে, মঞ্চে না হোক, হলঘরে বসে, অনেক লোকের সামনে তার মন থেকে গান সম্পূর্ণ চলে যায়। সে গুঞ্জনকে দেখতে পায় না। আর গুঞ্জন ঘরে না ঢুকলে তার গানও হয় না। এ কথা সে কাকে বোঝাবে!

কলেজে তার এই অবস্থাটা লক্ষ করেছে যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্য রায়। যাজ্ঞবল্ক্য সাহিত্য করে। গল্প কবিতা লেখে। সে সব অবশ্য তেমন পড়েনি সোমনাথ। পড়ার চেষ্টা করে দেখেছে। প্রায় কিছুই বুঝতে পারেনি। সে চেষ্টা আর করেনি। যাজ্ঞবল্ক্যকে কুণ্ঠার সঙ্গে বলেওছে সোমনাথ। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার হল, কিছুই তাতে মনে করেনি যাজ্ঞবল্ক্য। খুব হেসে বলেছিল, তুমি গিয়েছিলে কেন পড়তে। পড়ার আগে আমাকে একবার জিগ্যেস করে নেবে তো!

—সে কী, জিগ্যেস করব কেন?

—বাঃ, আমার রচিত সাহিত্য পড়ার আগে, আমার পারমিশন নেবে না?

সোমনাথ, হকচকিয়ে গিয়ে বলে, এই যে এত লোক বই পড়ে সবাই কি অথরের পারমিশন নিয়ে পড়ে। তা কখনও হয়!

যাজ্ঞবল্ক্য গম্ভীর হয়ে বলেছিল, তা একরকম করে সকলেই নেয় বইকি।

সোমনাথ বলল, এমন কথা তো কখনও শুনিনি। তোরা লেখক মানুষ, তোরা অবশ্য বেশি জানবি আমার থেকে।

যাজ্ঞবল্ক্য ততোধিক গম্ভীর, জানব তো বটেই। সোমনাথ বলতে গিয়েছিল, অবশ্য রবিঠাকুরের রচনাবলী নিয়ে তো আছে কত নিয়ম। গান নিয়ে আছে। কিন্তু সে যে সব তো ছাপার ব্যাপারে, গাইবার ব্যাপারে, পড়ার ব্যাপারে তো নয়।

যাজ্ঞবল্ক্য তাকে বাধা দেয়, দাঁড়াও, দাঁড়াও। রবিঠাকুর, শরৎচন্দ্র, নজরুল এসব পড়ার পারমিশন তুমি কোথায় পেয়েছিলে, তোমার ওই ডি. এল. রায় পড়ার পারমিশন?

—পারমিশন আবার কার কাছে পাব। বাড়িতে বই ছিল দু' চারটে, বাবা দিল, তা ছাড়া সিলেবাসে তো ছিল, ইস্কুলে... মাস্টারমশাই ছিলেন...

যাজ্ঞবল্ক্য বলে, পথে এসো। হয় বাপ-মার কাছে শুনেছ। নয় ইস্কুল কলেজে মাস্টারমশাইরা বলবে। নয়ত, সিলেবাস পারমিশন দেবে! তোমার তো মাস্টারমশাই ওই একজন! তাঁকে তো আর এখন... যাক গে, সুতরাং তোমার আমাকে জিগ্যেস করা উচিত ছিল, বুঝেছ!

¯c‡ivMx

সোমনাথ, এতক্ষণে খানিকটা আঁচ পায়, বলে, ও রঙ্গ করছিস ! তা জিগ্যেস করলে দিতিস, পারমিশন ?

যাজ্ঞবল্ক্য মাথা নাড়ে, মোটেই দিতাম না।

—কেন ?

—বলতাম এই সময়টা আমার লেখা পড়বার চেষ্টা না করে গান করো। গান শোনো।

সোমনাথ, খানিক থতিয়ে গিয়ে বলে, সময় তো বিশেষ পাই না। গানের সময়।

তাহলে গান ভাবো। তুমি তো ভাবতে পারো গান।

গান ভাবা। যাজ্ঞবল্ক্য, অদ্ভুতভাবে দু একটা জিনিস বুঝে ফেলে। কী করে সেটা জানে না সোমনাথ। যদিও সোমনাথ ওর গান ভাবার ব্যাপারটা কোনও দিন স্বীকার করেনি কারও কাছে। যাজ্ঞবল্ক্যর কাছেও না। তবু, মনে মনে মেনেছে, একমাত্র ওই ধরতে পেরেছে সোমনাথের ওই বিশেষ স্বভাবটা।

অদ্ভুত একটা গল্প বলেছিল যাজ্ঞবল্ক্য। ওইরকম বিচিত্র নানা গল্প ও বলত, সত্যি না মিথ্যে কে জানে। যাজ্ঞবল্ক্যর সঙ্গে সোমনাথের আলাপ শৈল মাস্টারমশাই, বিষ্ণুনগরে চলে যাবার পর। এখানকার বাড়ি বেচে, অসুস্থ শৈলমাস্টার চলে গেলেন, পৈতৃক বাড়িতে, বিষ্ণুনগরে। শৈল মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতেই দেখেছিল যাজ্ঞবল্ক্যকে। সৌমেন চক্রবর্তীর সঙ্গে। সৌমেন চক্রবর্তী জানতেন মাস্টারমশাইয়ের কথা। গায়ক হিসেবে, শৈল ঘোষালকে সোমনাথ নিজের বাবা ছাড়া ওই আর একজনের কাছেই সম্মান পেতে দেখেছে। সৌমেনবাবু। সৌমেনবাবু শৈল ঘোষালের যৌবনকালের গান শুনেছিলেন। মধ্য-যৌবনকালের গান। সৌমেনবাবু পড়াতেন বিষ্ণুনগর কলেজে। আর ঘুরে বেড়াতেন, দূর দূর গ্রামে। বাউলদের সঙ্গে, ফকির-দরবেশদের সঙ্গে দিন কাটাতেন। তাদের জীবন জানতে জানতে তাদের গান জানতে জানতে, নিজের জীবন কাটিয়ে দিলেন সৌমেনবাবু। এখন, রিটায়ার করার পরেও, মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ান একটা কাঁধঝোলা নিয়ে। বই লিখেছেন। সে সব বইয়ের খুব আদরও হয়েছে। দেশের লোক মানে সৌমেন চক্রবর্তীকে।

যাজ্ঞবল্ক্যকে দেখেছিল সোমনাথ, এই সৌমেনবাবুর শাগরেদ হিসেবে। দুপুরের ট্রেনে, এক ছুটির দিন মাস্টারমশাইয়ের খবর নিতে গিয়ে দ্যাখে, ওই দুজন। যাজ্ঞবল্ক্যের পরিচয় দিয়েছিলেন সৌমেনবাবু, তরুণ কবি। তরুণ কবি ব্যাপারটা জীবনে শোনেনি সোমনাথ। পাঞ্জাবি আর প্যান্ট পরা একটা ছেলে। খুব রোগা, সোমনাথের কাছাকাছি বয়স। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, এক মুখ দাড়ি। একটা চশমা মাঝে মাঝে পরছে। মাঝে মাঝে খুলছে। এর আগে কোনও চশমাপরা লোককে এ কাজ করতে দ্যাখেনি সোমনাথ। পরে, মাঝে মাঝেই এই দুজনের সঙ্গে দেখা হত সোমনাথের। যাজ্ঞবল্ক্য কোনও দিন চশমা পরে আসত কোনওদিন বলত চশমাটা হারিয়ে গেছে। সৌমেনবাবু

¯c‡ivMx

হাসতেন। ওর কথার সত্যি মিথ্যে বোঝা খুব মুশকিল। তখন ওদের দেখা হত আলেখ্য বলে একটা স্টুডিওতে। বিকেলের দিকে সেখানে আসতেন সৌমেনবাবু। আর প্রায় সব দিনই সেখানে জুটে যেত যাজ্ঞবল্ক্য। শৈল ঘোষালকে হারানোর পর, খানিকটা শৈল ঘোষালের আবহাওয়া পাওয়া যাবে, এই আকর্ষণে, ওই আলেখ্য স্টুডিওতে মাঝে মাঝে চলে যেত সোমনাথ। কতই বা দূর। ট্রেনে মিনিট কুড়ি পথ। সৌমেন চক্রবর্তী তাকে জিগ্যেস করতেন শৈল মাস্টারমশাইয়ের কথা। নিজেও বলতেন। বলতেন, আমি লিখব মাস্টারমশাইকে নিয়ে। কখন লিখব। সৌমেনবাবুর লেখা বিশেষ পড়েনি সোমনাথ। একটা লেখা তাকে পড়ে শুনিয়েছিল যাজ্ঞবল্ক্য। কী একটা পত্রিকা থেকে। একজন অন্ধ ভিখারিণীর কথা লিখেছেন সৌমেনবাবু। কিন্তু শুধু ভিক্ষে করে বলেই তার কথা লিখেছেন তা নয়। লিখেছেন সে গান গায় বলেও। গান গেয়ে ভিক্ষে করে। ট্রেনে। সোমনাথ যাওয়া আসার পথে দেখেওছে তাকে। খুব চড়ার দিকে গলা। বেশ সুর আছে। চিনত, কিন্তু জানত না সোমনাথ ওর নাম সরযূ। সৌমেনবাবুর লেখাটার নাম ঃ সরযূর সাক্ষাৎকার। সেখানে, সরযূ, জন্মান্ধ সরযূ সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তোমার উচ্চাশা কী এই প্রশ্নের উত্তরে সৌমেনবাবুকে বলেছে, ওর ছেলে জন্মানোর আগে ও শুধু আশা করেছে, যেন ওর ছেলের চোখ দুটো ভাল হয়। যেন দেখতে পায় ওর ছেলে।

এক লহমায় মনে পড়েছিল সোমনাথের, বাবা বলেছিল আমার যেখানে যেখানে সুর লাগল না, সেখানে সেখানে তুই কিন্তু সুর লাগাস।

শুধু গানে নয়, জীবনেও সুর লাগানোটা কত কঠিন, একটু একটু বুঝতে পারে সোমনাথ। সরযূর সাক্ষাৎকারটা পড়ে শোনানোর জন্য সোমনাথ আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে।

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যর সঙ্গে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করাটা ছিল খুব কঠিন। খুবই অসুবিধাজনক। স্থান-অস্থান মানত না। কেবলই বলত, হোক, হোক।

প্রথমদিন, শৈল ঘোষালের বাড়িতে যেদিন আলাপ হল ওদের সঙ্গে, সেদিন, গান জানে কিনা, সৌমেন চক্রবর্তীর এই প্রশ্নের উত্তরে, না-সূচক মাথা নেড়ে মুখ নামিয়ে বসেছিল সোমনাথ। শৈল ঘোষাল বলেছিলেন, গান জানে না। তবে, তোমরা যদি শুনতে চাও... যা জানো শোনাও। শেষ কথাটা সোমনাথকে বলা।

সোমনাথ গেয়েছিল, শৈল ঘোষালের প্রিয় গান, তোমারে কী বলো বলিব শ্যামল! আসলে মনে মনে ওই কথাটা সে শৈল ঘোষালকেই, অসুস্থ শৈল ঘোষালকেই বলেছিল কয়েকদিন ধরে। মা-বাবা পর। তখন তো শৈল ঘোষালই তার শেষ আপনজন!

গান শুনে সৌমেনবাবু বলেছিলেন, আরে! এ তো আপনার বয়সকালের গলা। তবে আপনার গলা আরও ভারী ছিল, এরটি তীক্ষ্ণ। আরও দু-তিনটি

¯c‡ivMx

গান গাইতে হয়েছিল সেদিন।

শৈল ঘোষালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে, সৌমেনবাবু ফিরে গেলেন নিজের বাড়ি। আর যাজ্ঞবল্ক্য একটা রিকশায় উঠল তাকে নিয়ে। দুজনের একই গন্তব্য। স্টেশন। একই ট্রেন ৮টা-৫৫। সোমনাথ আগে নামবে। যাজ্ঞবল্ক্য পরে। রিকশা চলতে শুরু করতেই, যাজ্ঞবল্ক্য বলল, হোক, একটু হোক।

সোমনাথ কিছুই বুঝল না, মানে!

—ওই যে গান! এক লাইন, দু-লাইন হোক!

—সে আবার কি!

—দু-লাইন। আচ্ছা বেশ এক লাইন।

—হোক না হোক। গুনগুন করে।

—তা কখনও হয় নাকি!

যাজ্ঞবল্ক্য ছাড়ার পাত্র নয়। ট্রেনে উঠে বসার জায়গা থাকতেও সে বসবে না। বসতেও দেবে না সোমনাথকে। দাঁড়াবে দরজায়। ট্রেন ছাড়ামাত্র। হোক, হোক। ওইটা, ওই যে, এ কি মধুর ছন্দ!

এমন আরম্ভ করল যে, সামলানো মুশকিল। খুব বেশিক্ষণ কাউকে না বলতে পারে না সোমনাথ। শেষে ধরল গুনগুন করে।

বাঃ বাঃ। যাজ্ঞবল্ক্যর উৎসাহ দেখে কে। ততক্ষণে কুড়ি মিনিট পার। সোমনাথের স্টেশন এসে গেছে। যাজ্ঞবল্ক্যও নেমে পড়ল সোমনাথের সঙ্গে, লাস্ট ট্রেনে ফিরব। আপনি 'আয়রে বসন্তটা' জানেন!

—না, না, প্রায় জানিই না...

—হোক, হোক, ওই প্রায় না জানাই হোক না...

যাজ্ঞবল্ক্য হল এই।

সেই যাজ্ঞবল্ক্য এই দশ বছরে একেবারে গণ্যমান্য হয়ে গেল। সে এখন কলকাতায় থাকে। রাতে আর আগের মতো ঘুরে বেড়ায় না রাস্তায় রাস্তায়। রাতের যে কোনও সময় এসে ডেকে তোলে না সোমনাথকে। যখন তখন কয়েকদিনের জন্য উধাও হয়েও যায় না।

সেসব দিনে নিয়ম-টিয়ম বলে কিছুই ছিল না যাজ্ঞবল্ক্যর। রাতে, শোয়ার ঘরের জানালায় খটখট আওয়াজ পেয়ে সোমনাথ বালিশ থেকে মাথা তুলে আধশোওয়া ঘুরে দেখল, জানলায় অর্ধেক ছায়ামূর্তি।

—কে? কে?

—সোমনাথদা, আমি যাজ্ঞ! দরজা খোলো।

—সে কী রে, তুই!

ততদিনে যাজ্ঞ তুই, আর 'সোমনাথদা' হয়ে গেছে ওরা পরস্পরের কাছে।

—কী হয়েছে আমি তো! খোলো না বাবা দরজাটা।

দরজা খুলে, উস্কোখুস্কো যাজ্ঞবল্ক্যকে ভেতরে এনে বলল সোমনাথ, তুই, এখন কোত্থেকে এলি!

¯c‡ivMx

—এখন তো না। নেমেছি তো সেই লাস্ট ট্রেনে। একটা দশে।

সোমনাথ টেবিলের টাইমপিসের দিকে তাকায়। সাড়ে তিনটে।

যাজ্ঞবল্ক্য নিজেই তার মশারির একটা কোণার দড়ি খুলে ঢালু করে দেয়। বসে সেখানে। রোগা প্রায় বাঁশপাতার মতো। চোখের তলায় কালো ক্লান্তি। মুখ হাসিতে ঝলমল করছে, কতক্ষণ রাস্তায়, প্ল্যাটফর্মে ঘুরলাম। নদীর ধারে। বসে ছিলাম ঘাটের সিঁড়ির ওপর। চা খেলাম।

—কোথায় খেলি ? এত রাতে !

—এখন তো নয়, চা খেয়েছি দু'ঘণ্টা আগে। ডাউন লাইনের ধারে, মদের দোকানের গলিটার পাশে।

—যাজ্ঞ, জায়গাটা ভাল নয়। ওরকম করিস না।

—জায়গা ভাল নয় তো কী হয়েছে। আমার কাছে কী আছে যে নেবে।

সত্যিই যাজ্ঞবল্ক্যর কাছে নেবার মতো কী-ই বা থাকে। পাঁচ-সাত টাকার বেশি নয়।

সোমনাথের মুখে ঘটনাটা শুনে সৌমেন চক্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন, কবিত্ব ছাড়া দেখছি ওর হারানোর কিছুই নেই।

সোমনাথ অবশ্য 'কবিত্ব' ব্যাপারটা কাকে বলে ঠিক জানে না। এই মাঝরাত্তিরে এসে ডেকে তোলাটাকে কি কবিত্ব বলে ?

যাজ্ঞ বলে, গান হোক। গান শুনতে এলাম।

আকাশ থেকে পড়ে সোমনাথ, গান ? এখন ?

যাজ্ঞ ততোধিক আশ্চর্য, হ্যাঁ ! গান ! এখন ! কী হয়েছে তাতে।

কী বলবে সোমনাথ। একে। চারদিকে ঘেঁষাঘেষি বাড়ি। বাবা যাওয়ার পর তখন সোমনাথ একা এই ভাড়া বাড়িতে এসে উঠেছে। ওখানে থাকলে পাগল হয়ে যেত। এটা কলোনি পাড়া। বেঁটে বেঁটে ঘর। ওপাশের বাড়ির কথা, ঝগড়া, হাসি সবই কানে আসে। এখানে গান হলে নিশ্চয়ই ওদিকেও যাবে। সোমনাথ একদিনও গান গায়নি। সে অবস্থাও তার নয়। সোমনাথ বলে, না রে যাজ্ঞ ! এখন, এই শেষরাতে। চারপাশে সবাই ঘুমোচ্ছে।

—ও আচ্ছা। সরি। ঠিক আছে। ঘুরে আসছি।

যাজ্ঞবল্ক্য উধাও। যেভাবে এসেছিল, সেভাবেই।

সোমনাথ ফিরে ডাকবে, তার অবকাশই হল না।

এত রাতে কোথায় ঘুরে আসবে যাজ্ঞবল্ক্য !

দরজা আটকে শুয়ে পড়ল সোমনাথ।

সাত-পাঁচ ভাবনায়, একবার কেটে যাওয়া ঘুম আর আসতে চায় না। এত রাতে এইভাবে যাজ্ঞকে ছেড়ে দেওয়াটা মোটেই উচিত হল না। আটকানো উচিত ছিল। কিন্তু সোমনাথ জোর করলেই কি যাজ্ঞ শুনত ! তাছাড়া কাউকে কোনও বিষয়ে জোর করতে পারে না সোমনাথ। জোর যা করেছে, ছোটবেলায় মা-বাবার ওপরই করেছে। যেমন বাবাকে বলেছিল,

¯c‡ivMx

মাস্টারমশাইয়ের ইস্কুলে পড়ব। ববা কাঁচুমাচু হয়ে কোনওমতে বলেওছিল শৈল ঘোষালকে। শৈল ঘোষাল নিজের স্কুলে নিয়েও নিয়েছিলেন সোমনাথকে। সেইরকম গম্ভীর অথচ হাসি-হাসি চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, পড়তে তো তোমার ইচ্ছে করে না, তাই না!

ঠিকই বলেছিলেন তিনি। পড়তে তেমন ভাল লাগে না সোমনাথের। আর, পড়লেও, পড়ার বিষয়গুলো সে দ্রুত ভুলে যায়। অন্যপক্ষে, খুব তুচ্ছ জিনিসও সে মনে রাখতে পারে। যেমন পাতার ওপর একটা পিঁপড়ে।

হল কি, সামনের দেবদারু গাছ থেকে একটা পাতা হাওয়ায় উড়ে পড়ল তাদের চৌবাচ্চায়। সারাদিন অমন পড়ে। কারণ কুয়োর পাশে খোলা চৌবাচ্চা। সেই জল কেউ ব্যবহার করে না, বাসন-টাসন মাজা ছাড়া। শুধু বাবা তাতে মাঝে মাঝে মাছ ছাড়ে। মুড়ি দেয়। ছোলা। সেই সময় ওই জলে বাসন মাজা বন্ধ হয়ে যায়। ওই জল নিলে মাছেদের ডিসটার্ব হবে তো। মা রাগ করে। সোমনাথকে নিয়ে বাবা চৌবাচ্চার জলে মাছেদের চালচলন লক্ষ করে মন দিয়ে। কপ কপ করে মুড়ি খাওয়া দেখে উৎসাহিত হয়। বলে, দেখিস, এবার বড় হবে। কিন্তু এমনই কপাল যে মাছ বাঁচে না।

সেই মাছের চৌবাচ্চায় একটা পাতা উড়ে পড়ল। চৌবাচ্চায় তখন মাছ নেই। এমন মাঝে মাঝেই হয়। কেননা, অল্পদিন আগেই পর পর সব মাছ মরে ভেসে উঠতে মায়ের বকুনি চলেছিল কয়েকদিন। এবং বাবাও নিরাশ হয়ে আর মাছ ছাড়বে না দু'এক মাস। ক'দিন মনমরা থাকবে। তারপর হঠাৎ একটা রবিবার নেত্র ভারীকে বলবে, দাঁড়াও তো, দাঁড়াও তো। কাজ আছে। নেত্র ভারী তাদের খাওয়ার জল দিতে আসে। কাঁধে বাঁক নিয়ে বাঁকের দুই দিকে দুটো টিন ঝুলিয়ে। বেশি পয়সা দিলে চৌবাচ্চা ভরে দেয়। বাবা এমন মাঝে মাঝেই দাঁড়াতে বলে নেত্র ভারীকে। আর তখন সোমনাথ বলে, চৌবাচ্চাটা খুলে দেব বাবা! সাঁড়াশি দিয়ে?

চৌবাচ্চার নীচের জলনিকাশি ফুটোয় গুঁজে রাখা ন্যাকড়া সাঁড়াশি দিয়ে টেনে খুলে দিতে হয় সোমনাথকে। এ কাজটায় সোমনাথের খুব উৎসাহ। যদিও সোমনাথের জানা যে বাবা ভারীকে দাঁড়াতে বলামাত্র মা বেরিয়ে এসে বাধা দেবে, না, দাঁড়াবে না। নেত্র, তুমি যাও।

বাবা মাকে বলবে, এবার আর পুষব না।

—তবে কী করবে, শুনি।

—এবার জিয়োবো।

বিরাট একটা আশ্বাসের কথা বলতে পেরে বাবা মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে। মা ভ্রূক্ষেপ মাত্র না-করে বলবে, না, হবে না ওসব। যাও তো নেত্র।

নেত্র জানে পয়সা পাওয়া যাবে। নেত্র নড়বে না। হাসি হাসি মুখে, 'আমার কী দোষ' ধরনের ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।

¯c‡ivMx

মা চেঁচাবে, আমার সাঁড়াশি নিবি না সমু, খবরদার নিবি না।

বাবা প্রবোধ দেবে, তোমার সাঁড়াশি তো নয়, রান্নার সাঁড়াশি কখ্খনও নেবে না সমু, ওটা তো স্টোভেরটা, ওই পলতে বের করার, সাঁড়াশিটা ইস্ক্রুপ টাইট দেবার সাঁড়াশি, তো ওটা... বাবা বলে চলবে, সোমনাথ চৌবাচ্চা খুলতে থাকবে, হু হু করে জল বেরোবে।

আর মা, যা খুশি করোগে তোমরা, বলতে বলতে চলে না গিয়ে, ফিরে, চৌবাচ্চায় উঁকি মারবে আর বলবে, ইস্, কী ছ্যাতলা ধরে গেছে। নেত্র, তুমি আধঘণ্টাটাক পরে ঘুরে এসো তো, আমি এটার একটা গতি করি। সমু, ছোট ঝ্যাঁটাটা দে তো... ব্যস, শুরু হয়ে যাবে কর্মযজ্ঞ!

অবশ্য মাছ জিয়োনোতেও মায়ের যে কিছু লাভ হয় তা নয়। কেননা, দরকার বা তাড়াতাড়ির সময় ওই মাছ রান্নার জন্য তুলতে গেলে বাবা ঠিক বলবে, থাক না, এখন থাক। রোববার ধরব। 'ধরব' কথাটার অর্থ সোমনাথ জানে। সে লাফাতে থাকে, মাছ ধরব। মাছ ধরব। বাবা, রোববার কবে।

—পরশু।

'ধরা' মানে একটা কঞ্চির বা পাটকাঠির আগায় একটা দড়ি বেঁধে, তাতে বঁড়শি আর মাখা আটার গুলি লাগিয়ে, চৌবাচ্চায় ছিপ ফেলা। তাতে সোমনাথের খুবই আনন্দ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বাবা খেতে বসে অনুযোগ করে, পোষা মাছের টেস্ট তেমন ভাল হয় না। ভালই তো ছিল বেচারারা। সাঁতার-টাতার কাটছিল...

এসব কথা যে মায়ের সহ্য হবে না, জানা কথা। মা বলে, উঁ! সাঁতার কাটছিল! কত জায়গা তোমার সাধের পুকুরে। ওইজন্যই তো সব দু'দিন বাদে বাদেই মরে মরে ভেসে উঠছে। এবার দেখি কে মাছ পোষে এ বাড়িতে। কালই আমি লোক ডেকে মাটি ফেলে ওই চৌবাচ্চা বুজিয়ে দিচ্ছি।

সোমনাথ আবারও খুশি। কী মজা, দারুণ হবে। মাটি কে আনবে মা! নেত্র ভারী? বাঁকে করে আনবে?

—তুমি চুপ করো!

এরপর বেশ কিছুদিন আর মাছ পোষা হয়নি। এখনও, সেইরকম একটা না-পোষার পর্যায় চলছে, সেইসময় একটা পাতা উড়ে পড়ল চৌবাচ্চায়, দুপুরবেলা। সোমনাথ দেখল, পাতার ওপর একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে। কীভাবে, কোথায় এল, ঠিক বুঝতে পারেনি এখনও। পিঁপড়েটা একবার পাতার এদিক যাচ্ছে। একবার ওদিক। পাতা থেকে নামার উপক্রম করে মুখটা নাকি পাটা নাকি শুঁড়টা জলে প্রায় ছোওয়া মাত্রই যেন বুঝতে পেরে উঠে উল্টোদিকে যাচ্ছে আবার। বালক সোমনাথ ছোট্ট একটু টোকা দিল জলে। পাতাটা দুলে উঠল। পাতাটা টোকা দিল এবার। পাতা বেশ ভাল মতো টালমাটাল হল। ঘুরে গেল একপাক। পিঁপড়েটা একমুহূর্ত চুপ করে গিয়েই পরক্ষণেই পাতার মধ্যেকার শিরা ধরে লম্বালম্বি দৌড় দিয়ে পৌঁছল প্রায় বোঁটার ওপরটায়।

¯c‡ivMx

থমকালো। বোঁটার ওপারেই তো আবার জল। সেই জলে হাতের পাতা দিয়ে অল্প অল্প আঘাত করে ঢেউ তুলে তুলে পাতাটাকে চৌবাচ্চার গায়ে নিয়ে গেল সোমনাথ। খাড়া গা চৌবাচ্চার। জললাগা গা। খানিক খানিক শ্যাওলাধরা-বা। পিঁপড়ে একবার চৌবাচ্চার গায়ে মুখ নাকি শুঁড় নাকি পা লাগিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে আর অমনি পাতাটা সরে আসছে। পিঁপড়েটা ফস্কে পড়ল জলে। পিলপিল সাঁতার কাটছে। পাড় পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে কিন্তু সোমনাথ-সৃষ্ট ঢেউয়ের আঘাতে পাড়ে উঠতে পারছে না। সোমনাথ পাতাটাকে ধরে পিঁপড়েটাকে ঠেলে নিয়ে একটুক্ষণ লাগিয়ে রাখল চৌবাচ্চার গায়ে। পিঁপড়েটা উঠতে পারল। ধীরে ধীরে চৌবাচ্চার খাড়া গা বেয়ে উঠতে উঠতে কিনারা পেরিয়ে পেয়ে গেল লাগোয়া কুয়োটার কালো মসনে-পড়া গা। পুরনো শ্যাওলা শুকিয়ে রয়েছে এখানেও। কুয়োর গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেল কখন সোমনাথ আর দেখতে পেল না।

পরে আবার কুয়োটার মধ্যে পড়ে যাবে না তো!

তখন তো আর সোমনাথ থাকবে না।

নাঃ। পড়লেও উঠে পড়বে ঠিকই। যেভাবে খাড়াই ধরে উঠে গেল জল থেকে!

পড়া মনে থাকবার বদলে সোমনাথের মনে থেকে যায় পিঁপড়ের ওই উঠে যাওয়াটুকু। পাতার শিরা বরাবর লম্বালম্বি দৌড়টুকু। জল বা বিপদ চিনতে পেরে ফিরে আসাটুকুও। মনে থাকে, কুয়োর কালো মস্‌নে ধরা পুরনো গায়ের মধ্যে মিশে যাওয়াটুকু। ক্লাসে টিচারের দেওয়া লেখা লিখতে, লিখতে, বা বাড়িতে পড়তে বসলে পড়ার বদলে ওই পিঁপড়েটাকে মনে করত সোমনাথ। শুধু ছোটবেলার সেইসব পড়াশুনোর দিনেই নয়। প্রাপ্ত এমনকি পরিণত বয়স্ক হতে হতেও ওই পিঁপড়েটাকে মনে করত সোমনাথ। মনে করে। আর একা ওই পিঁপড়েটাকেই অবশ্য নয়। এমন আরও অনেক আছে তার মনে করার জিনিস। যেমন একদিন দুপুরে। সোমনাথদের স্কুলে কীসের যেন একটা ছুটি, মা ঘুমিয়ে, কিন্তু বাবা অফিস। বাবাদের অফিসে এইসব পরব-টরবে ছুটির কোনও প্রশ্নই নেই। শুদ্ধু রবিবার। তাও, রবিবারেও বাবা কখনও অফিস যায়। পুজোর আগে আগে। বলে ওভারটাইম না হলে চালাতে পারব না। তার এই ছুটির দিনটায় কেন বাবারও ছুটি নয়, এই নিয়ে মন খারাপ করে বসেছিল সে। দুপুরটা ঠিক যখন ঝাঁ ঝাঁ করতে শুরু করল, রান্নাঘরের ছোটমতো দরজাটা খুলে চুপি চুপি বেরিয়ে এল সে। তাদের বাড়ির পিছনের জঙ্গলটায় নামল। মা জানতে পারলে বকবে। তাদের বাড়ির পিছনে একটা পুরনো পুকুর। কেউ ব্যবহার করে না। চারপাশে নিচু জায়গা। তাদের বাড়ির পিছনের পাঁচিলটাও অনেকদিন আগে একটা ঝড়ে অর্ধেক ভেঙে পড়েছিল। তাদের বাড়িওয়ালা সারিয়ে দেয়নি। দিনে দিনে আরও ভেঙেছে। সেই ভাঙা পাঁচিলের অন্ধিসন্ধি দিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে পিছনের

¯c‡ivMx

পাঁচিলের ভেজা গা। খাড়া গা। খানিক শ্যাওলাধরা। জলের উপর সোমনাথ দাঁড়িয়ে আছে। কীসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সোমনাথ ? তাদের ইস্কুলের ভাঙা কোলাপসিবল গেটটার ওপর। সেই হেলে পড়া গেটটা এখন জলে ভাসছে। গেটটা তো লোহার, তবে জলে ভাসছে কী করে ? সোমনাথই বা কী করছে এখানে ! কাকে যেন কী জিজ্ঞেস করছে সোমনাথ। কাকে যেন ডাকছে। মুখের কাছে দু'হাত এনে চিৎকার করে বলছে সোমনাথ, দারোয়ানজি কা ঘর কাঁহা ? হাঁ। দারোয়ানজি কা ঘর ?... কঠিন সিমেন্ট পাঁচিলে আওয়াজ ধাক্কা খাচ্ছে, আওয়াজ ঘুরছে, আর সোমনাথের পায়ের তলায় কাঁপছে সেই কোলাপসিবল গেটের ভেলা। হঠাৎ জলের তলা থেকে উঠে, খাড়া পাঁচিলের গা বেয়ে একজন লোক উঠে যাচ্ছে। লোকটা উঠছে পাঁচিল বেয়ে হাঁচড় পাঁচড় করে নয়। হেঁটে। তার মাথা ও শরীর জলতলের সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায়। শরীর থেকে সম্মুখে প্রসারিত হাত যে অবস্থানে থাকে শরীরের সঙ্গে— দেওয়ালের সঙ্গে সেই সম্পর্ক রেখে, মাধ্যাকর্ষণ অগ্রাহ্য করে উঠে যাচ্ছে লোকটি। পায়ে কেডস। কিন্তু ভেজা ছাপ পড়ছে না খাড়া গা পাঁচিলের গায়ে। শৈল ঘোষাল। মাস্টারমশাই। উঠে যাচ্ছেন খাড়া দেওয়াল দিয়ে, মহাকাশচারীর মতো হেঁটে। সোমনাথ চিনতে পারল। আর তৎক্ষণাৎ দেখল তাঁর কপালে বসে আছে একটা পাখি। হলদে কালো গলা। পুঁতির মতো চোখ। যাঃ, উড়ে গেল ! সোমনাথ তাকিয়ে দেখল নীচে, জলে পিলপিল সাঁতার কাটছে বাবা। বাবা ওঠো, বাবা। উঠে পড়। বাবা তার হাত ধরছে, ফস্কে যাচ্ছে, ধরছে, আবার ফস্কে যাচ্ছে। বাবা, এই তো, আমি, সমু, ধরো বাবা। ধরো। এই গেটটার ওপর ওঠো। আর একটু দম রাখো। বাবা... ওঠো, ওঠো...।

ওঠো... ওঠো... সোমনাথদা, ওঠো, ও সোমনাথদা...

সোমনাথ চোখ খুলে দেখল যাজ্ঞবল্ক্য। জানলায়। ঘুরে আসছি বলেছিল। ঘুরে এসেছে।

একটু পরে, দুজনে চা নিয়ে বসেছে যখন, যাজ্ঞ বলল, ঘুমের মধ্যে কেমন গোঁ গোঁ করছিলে দেখলাম সোমনাথদা, কী ব্যাপার ?

সোমনাথ একটু চমকে বলে, গোঁ গোঁ... মানে, কই, কিছু না তো।

—দেখলাম নিজে। আর তুমি কিছু না বললেই হবে ? চায়ে চুমুক দিয়ে, বেশ নির্বিকার গলাতেই বলে যাজ্ঞবল্ক্য, বাবা-মা কি আর কারও চিরকাল থাকে সোমনাথদা। কিন্তু তাই নিয়ে দিন রাত গুমরে থাকার মানে হয় না। পারলে একটা প্রেমটেম করো। না পারো তো বিয়ে-থাও করতে পারো। দেখবে আবার স্বাভাবিক লাগছে সবকিছু।

সোমনাথ অবাক হয়। যাজ্ঞবল্ক্যকে মাঝে মাঝে বেশ নিষ্ঠুর লাগে। এমন

¯c‡ivMx

ছাড়া-ছাড়া, খানিক শ্লেষ মিশিয়ে বলে কথাগুলো। কেন বলে অমন!

সোমনাথ খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আর এক কাপ খাবি যাজ্ঞ? বানাব?

—বানাও, বানাও। কিন্তু তার আগে গান লাগাও একটা! প্রভাতে যারে নন্দে পাখি! এইটা শুনব।

সোমনাথ একচিলতে বারান্দায় গিয়ে কাপ ধুতে ধুতে বলে, গান এখন হবে না রে!

—কেন? হবে না কেন? এখন তো আর কেউ ঘুমোচ্ছে না চারদিকে। সবাই তো উঠে পড়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বেশ আহত যেন।

বারান্দা থেকে ঘরে আসতে আসতে বলে সোমনাথ, না রে। কিছুদিন হল, গান আর টের পাচ্ছি না। গান নিভে গেছে। ভেতরে। মাঝেমাঝে এমন হয় রে আমার।

যাজ্ঞবল্ক্য অধৈর্য, ছাড়ো তো! লাগাও, লাগাও। যা তোমার খুশি।

—তুই একটু বোস তো আগে! কাল রাত থেকে তো কিছু খাসনি নিশ্চয়ই। আমি একটু আসছি।

—আরে থামো থামো! খাওয়ার কিছু দরকার নেই। খিদে মোটেই নেই আমার। গান শোনাও।

—বোস। পাগলামি করিস না। আমিও তো খাব। আসছি।

কাছেই দোকান। গরম জিলিপি আর সিঙাড়া নিয়ে ফেরে সোমনাথ। সত্যি সত্যিই কিছুদিন হল, গান গাইতে আর ইচ্ছে হয় না সোমনাথের। মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেলেও হয় না। বাবা মারা যাওয়ার পরেই এটা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্যদের সঙ্গে যখন আলাপ হল মাস্টারমশাইয়ের ঘরে তখনও তো বাবা আছে। অসুস্থ, কিন্তু আছে। তাই মাস্টারমশাই গাইতে বললে, সোমনাথ গেয়েছিল যাজ্ঞ আর সৌমেনবাবুর সামনে। এখন মাস্টারমশাই বললেও সে গাইতে পারবে না। চেষ্টা করবে। কিন্তু গলা দিয়ে যে আওয়াজ বেরবে সেটা যেন তার নয়। মাস্টারমশাইও অবশ্য তাকে জোর করেন না কখনও। তিনি বোঝেন। শৈল ঘোষাল বলেওছেন। হয়, এরকম হয় মাঝে মাঝে। তখন গান নিভে যায়। তখন প্রদীপকে বিশ্রাম দিতে হয় কিছুক্ষণ।

কিন্তু যাজ্ঞ কিছু শুনতে রাজি নয়। সোমনাথ ঘরে ঢোকা মাত্র সে বলল, আরে কী সব খাবার দাবার আনতে গিয়ে সময় নষ্ট করো। গান করো, গান। বুঝতে পারছি, তোমার মন খারাপ। মুড নেই। গান লাগাও, মন ভাল হয়ে যাবে।

এ সব শুনে অসহায় লাগে সোমনাথের। যাজ্ঞর চোখ বেশ অন্যমনস্ক। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কোনও কারণে সে একটু বিচলিত হয়ে আছে। সে কেবল গান শুনতে চায়। সে অন্যের মন বুঝতে চায় না।

দ্বিতীয় কাপ চা হাতে ধরিয়ে দেবার সময় একটু বোধ হয় সহানুভূতি জাগল

¯c‡ivMx

যাজ্ঞর। সে বলল, গান কখনও নিভে যায় না বুঝলে। সবসময় চলতেই থাকে। তোমাকে একটা গল্প বলি। তা হলেই বুঝবে। মস্ত বড় ওস্তাদের গল্প। নাম শুনেছ নিশ্চয়ই....

যাজ্ঞবল্ক্য যে গল্পটা বলেছিল, তা হল এই ভারত-বিখ্যাত ওই ওস্তাদের গলায় টনসিল, ফ্যানেনজাইটিস এই সব ছিল। মাঝে মাঝে রাড়ত। তা ছাড়া তিনি নিজের রেওয়াজের ঘরে অন্য কাউকে ঢুকতে দিতেন না। কচ্চিৎ কখনও দু একজন ভক্ত বা শিষ্য ছাড়া। তাদেরই একজন একদিন দেখল যে ওস্তাদজি গলায় একটা মোটা কম্ফর্টার জড়িয়ে হাতে এক গ্লাস দুধ নিয়ে এসে রেওয়াজে বসলেন। চোখ বন্ধ। একজন তানপুরো ছাড়ছে। এ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই। বেশ অনেকক্ষণ পরে, একটু গুনগুন মতো শোনা গেল। তারপর সুর বেরিয়ে এল। উঠতে লাগল। এবং এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে থেমে গেল আবার। আবার চুপ বহুক্ষণ। আবারও চোখ বন্ধ। কিছুক্ষণ পর আবারও হঠাৎ একটু সুর। ওই, এক মিনিটেরও কম! আবারও চুপ। মাঝে মাঝে হাতের আঙুল, হাত একটু নড়ছে। মাথা হেলছে একটু। কিন্তু সুর যখন আসছে, ওই এক ঝলকই আসছে। তবে তারপরই আবার নীরবতা। এই রকম চলল তিন সাড়ে তিন ঘণ্টা। অর্থাৎ যেহেতু গলায় চাপ দেওয়া এ সময় ডাক্তারের বারণ, তাই, মনে মনেই রেওয়াজ চলছিল এতক্ষণ।

গল্প শুনে সোমনাথ হাঁ। সত্যি না কি মিথ্যে তা বোঝার বাইরে। যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য বলেছিল, প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শোনা। সঙ্গে সঙ্গে এও বলেছিল, গান কখনও নিভে যায় না সোমনাথদা, গান সবসময়ই বয়ে চলেছে। কেবল মাঝে মাঝে আমরা তাকে শুনতে পাই। বেশিটাই পাই না। তোমার আজ মন খারাপ, তাই মনে হচ্ছে গান হবে না। চেষ্টা করো, দেখবে ঠিক এসে যাবে।

বলতে বলতেই কেমন উতলা হয়ে গেল যাজ্ঞবল্ক্য। বলল, আজ আমার গান শোনা খুব দরকার। বাড়িতে টেপটা খারাপ হয়ে আছে। স্যার, মানে, সৌমেনবাবু, কদিনের জন্য কী একটা মেলায় গেছেন। টেপটা সারাতে দিলে সাতদিনের কমে হবে না। তা ছাড়া পয়সাও নেই হাতে। তাই তো তোমার কাছে ঘুরছি। গাও না বাবা একটু।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে সোমনাথ। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গান গাইতে গেলে, তার এক ধরনের কষ্টই হয়। নিঃশ্বাস আটকে আসে। মাথাতেও কেমন একটা লাগে। তা ছাড়া সে একা একাও ইদানীং গান গাইতে পারছে না। মা অসুখে পড়ার পর থেকেই এটা শুরু হয়েছিল। বাবা চলে যেতে আরও চেগে বসেছে। তা ছাড়া গান গাইতে গেলেই তার বাবার কথা মনে পড়ে। ঠিক মনে পড়ে না। বরং ওই গানটা প্রথম প্রথম গাইবার সময় বাবা কী করছিল, সে কী করছিল, মা কোথায় বসেছিল, সব মনে পড়তে থাকে। ভয়ানক কষ্ট হয় তখন। আপনিই গান বন্ধ হয়ে যায়। এত সব তো আর বলা যায় না যাজ্ঞবল্ক্যকে। সোমনাথ শুধু বলল, না রে যাজ্ঞ, পারব না রে। এখন পারব

¯c‡ivMx

না। তা ছাড়া আমি তো গান জানি না। লিখিনি কখনও। যারা লিখেছে তারা হয়ত পারে। একটু চেষ্টা করলেই হয়ত পৌঁছে যায়। আমার হয় না রে। আমায় তুই ক্ষমা কর।

আশাহত হয়ে যাজ্ঞবল্ক্য বেশ রেগে গেল। বলল, মাপ চাইবার কথা তো আমার। রাত থেকে ঘুম ভাঙিয়ে তোমার কাছে গান শুনতে চাইছি, দোষ তো আমারই, আচ্ছা চলি।

—সে কী রে! খেলি না? জিলিপি সিঙাড়া সব পড়ে রইল যে।

—ওসব থাক। আমার তাড়া আছে।

—শোন, যাজ্ঞ

—কী আর শুনব। তোমার কাছে তো গান শুনতেই আসা। এ ছাড়া আর কী শুনব। আজ চলি। হ্যাঁ শোনো। সবসময় অত গান জানি না, গান শিখিনি বলার কী আছে! শেখোনি, শেখোনি। ব্যস। কে কী বলবে। আর এখন তো সময় পেয়েছ। দায়দায়িত্ব তো আর কিছু নেই। শিখলে এখনও শেখা যায়। হয় শেখো, নয়ত বিয়ে-থা করো। আমরা না হয় আর জ্বালাতন করব না।

যাজ্ঞবল্ক্য বেরিয়ে গেল। ওকে বোঝা যায় না। নিজের খেয়ালেই আছে। আবার মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরও হয়ে ওঠে। হোক গে। আজ একটা কথা বলে গেল, যেটা আশ্চর্য। ওই গল্পটা আশ্চর্য! সত্যিই কি গান সবসময় হয়ে চলেছে, বয়ে চলেছে পৃথিবী দিয়ে। আমরা কেবল, কখনও কখনও শুনতে পাই! বেশিটাই পাই না! কী করে ওই বেশিটাকে শোনা যায়! যারা শেখে তারা শুনতে পায় বুঝি। এটাও খুব অদ্ভুত বলেছে যাজ্ঞ। সত্যি তো। এখনও তো শিখতে পারা যায়। গান! সে বরং একবার জিগ্যেস করবে মাস্টারমশাইকে। শেখা কি যায় এখন আর! এই তেত্তিরিশ চৌতিরিশ বছরে পৌঁছে। কে রাজি হবে তাকে শেখাতে। কার কাছে যাবে সে! ঠিক। মাস্টারমশাইকেই বলে দিতে হবে। কিছু একটা নিয়ে তো থাকতে হবে সোমনাথকে। শৈল মাস্টারমশাই অনেক করেছেন সোমনাথের জন্য। সারাজীবন। গান শুনিয়েছেন ছোট থেকে। নিজের অজান্তে তুলে দিয়েছেন অনেক গান। পড়িয়েছেন। কিন্তু বিরাট কিছু হও, বলে মাথার ওপর চাপ তৈরি করেননি। বাবা মায়ের অসুখের সময় পাশে পাশে থেকেছেন। যতদিন না পর্যন্ত নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। সোমনাথও একটা ব্যাপারে অন্তত সৌভাগ্যবান ছিল। সে চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল এখানকার কলেজেই। মাস্টারমশাইয়ের কাছে কাছেই থাকবার সুযোগটা পেয়ে গিয়েছিল সে।

এখন দুপুরবেলার এই চাকরি আর বিকেল-সন্ধের টিউশনি দুটো ছাড়া সোমনাথ, বাকি জীবন কী করবে, তাও সে ঠিক করে দিতে বলবে শৈল মাস্টারমশাইকেই। গান যদি শেখা যায়। সত্যিই!

যাজ্ঞ্য অবশ্য বলে গেল, বেশ নিষ্ঠুরভাবেই বলে গেল অন্য একটা কথা।

বিয়েটিয়ে করো। আচ্ছা, কেন হঠাৎ হঠাৎ যাজ্ঞ অমন নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ওভাবে না বললেই কি হত না। বলুক গে। বললেই তো আর সত্যি ওসব বিয়ে টিয়ে নিয়ে আর ভাবতে যাচ্ছে না সোমনাথ। কত ভাল কথাও তো বলে যাজ্ঞ্য। আজই তো বলল। ওই গান বয়ে চলার কথা। ওই ওস্তাদের গল্প সত্যি হোক আর না হোক গান বয়ে চলার ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি। গান সব সময় বয়ে চলেছে। নিজের মতো বয়ে চলেছে গান। আমাদের শ্রুতিই শুধু পৌছয় না সেখানে। তাই বেশিটাই শুনতে পাই না আমরা। আমরা কাজে ব্যস্ত থাকি। সশব্দ সব কাজ। রাস্তা তৈরি। ট্রেন বানানো। বাড়ি ভাঙা। জল ওঠানো। পড়া মুখস্থ করা। স্কুলে ঘণ্টা দেওয়া। ব্রেক কষা। হর্ন দেওয়া। চেয়ার সরানো। বেঞ্চি টানা। মাইক বাজানো। সশব্দ সব কাজ। বোমা ফেলা, গুলি চালানোর মতো দরকারি সব কাজ। যাতে ব্যস্ত থাকি আমরা। আমাদের শ্রুতি পৌঁছয় না কোথায় একা একা নদীর মতো আধো অন্ধকার গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে গান। কোনও মা হয়তো তার বাচ্চাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য গিয়ে কোনও মতে এক আঁজলা নিয়ে এল।

সোমনাথের বাবার কাছে ছিল অমন এক আঁজলা জল। শৈল মাস্টারমশাইয়ের কাছে আছে অমন জল এক কলসী। গানের সময় তার বাবার চোখ থেকে যে জল পড়ত, শৈল মাস্টারমশাইয়ের চোখ থেকে পড়ে যে জল তারা কোথায় যায়? সে জল ওই গানের অদৃশ্য নদীতেই মেশে নিশ্চয়ই। বাকি জীবন, ওই গানের নদীর জন্যই নিজের শ্রুতি পেতে রাখবে সে। ওই গানের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করবে সে বাকি জীবন আর অন্য কিছুর মধ্যে জড়াবে না যাতে এর বাধা হয় এমন কিছুর মধ্যে যাবে না কখনও, ভাবল সোমনাথ।

ভেবেছিল সোমনাথ। ভেবেছিল, দশ বছরেরও বেশি আগেকার এক সকালবেলা, যাজ্ঞবল্ক্য রাগ করে তার ঘর থেকে চলে যাওয়ার পর। ভেবেছিল, পরের দিনই, বিকেলের টিউশনিটা সেরে সে রাত্রে চলে যাবে শৈল মাস্টারমশাইয়ের কাছে। রাতে থেকে যাবে তাঁর ওখানে। তাঁর কাছে বলবে সে কী করতে চায়। ভেবেছিল।

ভেবেছিল যে, সে কথা, সে, আজ, এই চুয়াল্লিশ বছরে পৌঁছে, ভাবছে আবার। ভাবছে, যে, তার পরদিন বিকেল থেকেই তার জীবনটা কীভাবে বদলাতে শুরু করেছিল। ভাবছে, একা বাড়িতে, শুয়ে শুয়ে, ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে করতে। যখন, পরদিন তাকে গান গাইতে হবে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে গান। সেদিন ইচ্ছের বিরুদ্ধে গান সে গাইতে চায়নি যাজ্ঞবল্ক্যর সামনে। এখন, অমন ইচ্ছের বিরুদ্ধে গান তাকে মাঝে মাঝেই গাইতে হয়। কেননা, যাজ্ঞবল্ক্য তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে গেছে দু তিন বছর আগে। এই

¯c‡ivMx

কলেজে প্রধান অতিথি হয়ে এসে ফাঁস করে দিয়েছে। কেবল গানেই নয়। আরও অনেক ব্যাপারেই এমন ইচ্ছের বিরুদ্ধতা করতে হয় তাকে। নিজের ইচ্ছের পক্ষে চলবার কোনও অধিকার কি তার আছে? অধিকার? মনে পড়া মাত্র অধিকার শব্দটা কড়া আঙুলে তার ঘাড় চেপে ধরে।

নিজের ইচ্ছের পক্ষে সে হয়তো থাকতে পারত যদি না তাকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হত। মনে পড়া মাত্রই, প্রতিশ্রুতি শব্দটা, তার হাত বেঁধে ফেলে। যদি না সে, বিকেলে সেই টিউশনির বাড়িতে যেত। কিন্তু দশ বছর আগেকার সেই বিকেলে তার কোথায় যাওয়া উচিত ছিল, সে কথা ভেবে এখন কী লাভ!

বরং ঘুম যখন আসবে না। ছাতে গিয়েই দাঁড়ানো যাক।

বিছানা থেকে উঠে অন্ধকারে ঘরের ভেতর দিয়ে ছাদে যাওয়ার দরজার দিকে এগোতে এগোতে দেখল সোমনাথ, গানের ঘরের জানলা দিয়ে অনেকখানি জ্যোৎস্না ঢুকে মেঝেতে পড়েছে, আর, জানলার ধারে, জ্যোৎস্নার মধ্যে একটু হেলে দাঁড়িয়ে আছে, রুমা বলে সেই মেয়েটির রেখে যাওয়া মোমবাতি।

৭

সারাটা রাত ছাদে থাকতে ইচ্ছে করে। খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে আকাশে। কালো ধূসর রঙ। বর্ষা আসতে দেরি নেই। দূরে দূরে সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। চারপাশে ঝোপ জঙ্গল পুকুর। মশা আছে ঠিকই। কিন্তু ছাদে, এই রাতের দিকে এত হাওয়া যে মশা অত লাগে না। এই হাওয়ায় গাছগাছালির একটা ঘন গন্ধ আসে। দূরে, মাঠের ওপরকার ভাঙা বাড়িটার মাথার উপর চাঁদ দাঁড়িয়েছে। ভেসে যাওয়া মেঘে আড়াল হল একবার। কোথাও কোনও গাছে একটা পাখি ডেকে উঠল। সোমনাথের পিঠে, মাথার পেছনে হাওয়া এসে লাগছে। সোমনাথ মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল হাওয়ার সোজাসুজি। তারপর ছাতের ওই প্রান্ত থেকে এ প্রান্তে হেঁটে আসতে লাগল।

এই হাওয়াটা যেদিক থেকে আসছে, অর্থাৎ সোমনাথ যেদিকে মুখ করে হাঁটছে, দক্ষিণ দিকটা, ওই দিকে আধ মাইল গেলে সোমনাথদের বাড়ি। বাড়ি মানে বাসা। যে-বাসায় সোমনাথ মা-বাবার সঙ্গে থাকত। আর সেই বাসা ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে, একেবারে নাক বরাবর দক্ষিণে গেলে সেই কলোনিপাড়া। যেখানে, মা বাবাকে হারিয়ে, একা সোমনাথ ঘরভাড়া নিয়ে উঠে গিয়েছিল। যে বাড়িতে যাজ্ঞবল্ক্য তার ঘুম ভাঙিয়েছিল। রাগ করে উঠে গিয়েছিল যে বাড়ি থেকে। যে বাড়ি থেকে তার পরের দিন বিকেলে সোমনাথ রওনা দিয়েছিল নাক বরাবর উত্তরের দিকে, তার টিউশনির বাড়ির দিকে।

সোমনাথ পড়াতে যেত হরি পুরকায়স্থর বাড়ি। হরিসাধন পুরকায়স্থ ব্যবসায়ী। বেশ বড়ই। শহরে কয়েকটি বাড়ি। দুটি ব্যাঙ্ক, আর একটি

¯c‡ivMx

সরকারি অফিসকে ভাড়া দিয়েছেন। বাজারে কয়েকটা দোকানঘর ভাড়া দেওয়া আছে বড় রাস্তার ওপর। তা ছাড়া জমি জায়গা অনেক। হরিসাধনের বাড়ি একটি ছেলেকে পড়াতে যেত সোমনাথ। হরিসাধনের ছেলে নয়। তাঁর শ্যালিকার ছেলে। বাল্যে পিতৃহীন। টাউনে থেকে পড়াশোনা করতে পারে যাতে তাই নিজের কাছে তাকে রেখেছেন হরিসাধন। ছেলেটির নাম বাপি, সোমনাথদের ইস্কুলেই পড়ছে তখন। হরিসাধনের নিজের একটি মেয়ে। তার বিয়ে হয়ে গেছে কিছুকাল আগে। এই বাপি বলে ছেলেটিরও এক দিদি আছে। হরিসাধনের মেয়ের চেয়ে কিছু ছোট। তারও বিয়ে এ বাড়ি থেকেই দিয়েছেন হরিসাধন। শৈল ঘোষালের সঙ্গেও খানিকটা সম্পর্ক আছে হরিসাধনের। শৈল ঘোষালও হরিসাধনকে পছন্দই করেন, দুটি পিতৃহীন ছেলে মেয়ের দায়দায়িত্ব নিয়েছেন বলেই হয়তো। শৈল ঘোষাল বিষ্ণুনগরে চলে যাবার আগে মাঝে-মধ্যে শৈল ঘোষালের বাড়ি যেতে হরিসাধনকে দেখেছে সোমনাথ। শৈল ঘোষালই সোমনাথকে দিয়েছিলেন এই পড়াবার কাজটা। ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস নাইন, চার বছর হল এ বাড়িতে এসেছে সোমনাথ। মা বাবার অসুখ, অশান্তি মৃত্যু সব সত্ত্বেও শৈল ঘোষালের দেওয়া কোনও কাজে সে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেনি কখনও।

সেদিন বিকেলে, প্রায় এক মাইল রাস্তা সাইকেলে এসে, হরিসাধনের বাড়ির রাস্তাটায় পৌঁছে, দূরে একটা মোটরবাইকের আওয়াজ শুনল সোমনাথ। তাকিয়ে দেখল, কিছু দূরে, গাছপালার আড়ালে বাঁক নিয়ে মিলিয়ে গেল একটা মোটর সাইকেল। অমিয় নাগ।

হরিসাধনের জামাই। তাঁর একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছে। প্রেমের বিয়ে। অমিয় নাগও ব্যবসায়ী। বয়স তারই কাছাকাছি। অমিয় নাগের বাস আছে দু তিনটে, লরি বা ট্রাকও আছে দু তিনটে। আছে কন্ট্রাক্টারির ব্যবসা। সম্প্রতি, এখান থেকে তিনটে স্টেশন দূরে পুব পাড়াতে একটা সিনেমাহল লিজ নিয়েছে। হরিসাধনবাবুর মেয়ের সঙ্গে তার স্থায়ী প্রেম চলেছে বছর তিনেক। যখন সোমনাথ এ বাড়িতে পড়াতে আসে, তখন চলছিল সেটা। তার দু বছর পর বিয়ে।

সোমনাথ সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে লম্বা উঠোনে দাঁড়িয়ে কাউকে দেখতে পেল না। হরিসাধন সাধারণত এসময় বাড়ি থাকেন না। তাঁর মেয়েরা এলে তারা ওপরে থাকে। তবে কাজের লোক দুটি— গীতার মা আর মন্টু এদের কাউকে না কাউকে দেখা যায়। আজ কেউ নেই। সোমনাথ, একতলায় পড়ানোর জন্য নির্দিষ্ট তার ঘরের দিকে এগোল। সাধারণত বাপি, সোমনাথ আসার আগেই বইখাতা খুলে অপেক্ষা করে সোমনাথের জন্য। আজ পর্দা সরিয়ে সোমনাথ দেখল বইখাতা খোলা কিন্তু বাপি নেই। সোমনাথ বসল। নিশ্চয়ই কাছাকাছিই আছে। বাথরুমে গেছে হয়তো। এসে যাবে। কোথাও খুটুর খাটুর আওয়াজ হচ্ছে। পাশেই তো রান্নাঘর। কোনও কাজের লোক

¯c‡ivMx

আছে বোধহয়। বাপির স্কুলের একটা খাতা হাতে তুলে ওল্টাল সোমনাথ। তখনই গন্ধটা পেল। কেরোসিনের গন্ধ। তীব্র গন্ধ। সোমনাথের গন্ধের নাক খুব তীক্ষ্ণ। কী হল ? কেউ কি কেরোসিনের টিন উল্টে ফেলেছে নাকি ! নিজের অজান্তেই প্রায় সোমনাথ উঠে পাশের রান্নাঘরের দিকে গেল।

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। নিজের গায়ে কেরোসিন ঢালছে। এক টিন ঢালা হয়ে গেছে, পাশে কাত হয়ে আছে সেটা। বাসন্তী রঙের শাড়ি সপসপ করছে। অন্য টিনটা পাশে নামিয়ে তাক থেকে দেশলাই নামাল। আর ঘুরে দেখল দরজায় দাঁড়ানো সোমনাথকে। মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ করে পাগলের মতো কাঠি বের করবার চেষ্টা করল, হাত ফস্কে নীচে পড়ল দেশলাই, নিচু হয়ে তুলে নিল আবার। পাগলের মতোই কাঠি ঠুকতে চেষ্টা করছে, একবার মিস করল। এতক্ষণে সম্বিত এল সোমনাথের। সোমনাথ ঝাঁপিয়ে হাত থেকে দেশলাই কাড়তে চেষ্টা করল। মেয়েটি দেবে না। ফোঁপাচ্ছে সে। ধস্তাধস্তিতে সোমনাথের সারা গায়ে কেরোসিন। ছাড়ুন, ছাড়ুন না-না-আ...। সোমনাথ তার হাত মুঠো করে ধরে, মেয়েটি তার বাহুতে আপ্রাণ কামড়ায়, দু'জনে গড়িয়ে পড়ে মেঝেতে। বেশ জোরে লাগে সোমনাথের হাঁটুতে। তাদের পতনশীল শরীরের ধাক্কায় কয়েকটি ছোটবড় চামচ মাটিতে পড়ে। একটি ডিশ খানখান হয়ে ভেঙে যায়। মেয়েটি একবার তার বুকে ঘুষি মারে, একবার তার কাঁধ কামড়ে দেয়, মেয়েটির চোখ উন্মত্তের মতো। সে যে হরিসাধনবাবুর মেয়ে তা যেন আর বোঝা যায় না। সোমনাথ তবু ছাড়ে না, মেয়েটির দুই হাত দু'দিকের মাটিতে চেপে, মেয়েটিকে নীচে ফেলে, তার হাত থেকে দেশলাই ছিনিয়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয় দরজার বাইরে। আর হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ তুলে দেখে, দরজার বাইরে দেশলাইটা কুড়িয়ে তুলছে অমিয় নাগ। তার পিছনে বাপি। তার পিছনে গীতার মা। কখন ফিরল অমিয় নাগ। সোমনাথের মনে হল ওই ধস্তাধস্তির মধ্যে অস্পষ্টভাবে একবার মোটরবাইকের শব্দ কানে এসেছিল যেন, কিন্তু তার চেতনায় প্রবেশ করেনি। সোমনাথ উঠতে গিয়ে দেখল তার হাঁটুতে বেশ ব্যথা।

অমিয় নাগ ধীরে ধীরে বলে, তা হলে এই ব্যাপার ? অ্যাঁ ! আমাকে একা দোষ দেবে তা কখনও হয় !

সোমনাথ কিছু বুঝতে পারে না।

মাটি থেকে অর্ধেক উঠেছে মেয়েটি। আঁচল মাটিতে। সে ফোঁপাচ্ছে এখনও। বলে, নোংরা ! নোংরা ! ইতর ! যাও ! মেঝে থেকে একটা ডিশভাঙা কুড়িয়ে ছুড়ে মারে। ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

অমিয় নাগ বলে, বাপি, এই দেশলাই-এর একটা কাঠি জ্বালিয়ে যদি ছুড়ি ওই ঘরে। কী হবে বুঝতে পারছ ? তোমার দিদি আর তোমার মাস্টার, দু'জনেই তো কেরোসিনে একেবারে মাখামাখি, হ্যাঁ ? তাই তো ?

¯c‡ivMx

হরিসাধনবাবু বাইরের দরজা দিয়ে ঢোকেন।

অমিয় নাগ বলে, কথা ছিল, ওই ফিক্সড ডিপোজিটটার ব্যাপারে। তাই ফিরে এসেছিলাম। এসে তো, এই... যাক। এবার আর আমাকে একা দোষ দেবেন না। আমাদের দেওয়া আংটি আর হারদুটো ফেরত পাঠিয়ে দেবেন।

বেরিয়ে যায় অমিয় নাগ।

সোমনাথ মাটিতে তাকিয়ে দ্যাখে মেয়েটি চেতনা হারিয়েছে, তার মুখে গ্যাঁজলা।

সোমনাথ বলে, ডাক্তার ডাকা দরকার। বাপি, হরিসাধনবাবু এতক্ষণে দেখতে পান ভূতলশায়িতা মেয়েকে। মুখের উপর ঝুঁকে ডাকেন, মালা। মালা রে। মালা। পা টেনে টেনে বাইরে আসে সোমনাথ।

বাইরে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁপায়।

ওই যে সেই উঠোন।

এই ছাদ থেকে নীচে তাকিয়ে দেখা যায়।

মালাদের উঠোন।

এই মালারই স্বামী সে এখন। এবং এখনও মালা তাকে অভিসম্পাত দেয়। সেদিন বাঁচিয়েছিল তাকে।

অমিয় নাগ, একের পর এক নারীসম্পর্ক তৈরি করে চলেছিল। মালার সঙ্গে প্রেম চলার সময়ও পাশাপাশি চলেছিল সেইসব সম্পর্ক। তৈরি হচ্ছিল ভাঙছিল, তৈরি হচ্ছিল। নতুন নতুন নারী ছাড়া থাকতে পারে না অমিয় নাগ।

বিয়ের দু তিন বছর পর একটু একটু করে সব জানতে পারছিল মালা। মাঝে মাঝেই বাপের বাড়ি চলে এসেছে। অমিয় নাগ বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে গেছে। তার মিথ্যে বলার ক্ষমতা অসাধারণ। এ কথা সোমনাথকে পরে বলেছিলেন হরিসাধনবাবু। বলেছিলেন তিনি অনেক বুঝিয়েছিলেন এবং নানা কারণে বহু অর্থও দিয়েছেন তাকে—কিন্তু অমিয় নাগ শোধরায়নি। শেষমেশ অন্য একটি মেয়ের কাছে সে রাতে নিয়মিত থাকতে শুরু করে—এবং সে-কথা জানতে পারা মাত্র মালা গতকাল রাতে বাপের বাড়ি ফিরে এসেছিল। আজ দুপুরের দিকে অমিয় নাগ আসে। এবং বলে, যা আগেও বলেছে, তুমি তো বউ। ও তো আর বউ নয়। তোমার আপত্তি কী। আর আপত্তি যদি করো, তবে শুনে রাখো, থাকতে যদি হয় আমার বাড়ি, তবে, এ সব মেনে নিয়েই থাকতে হবে। নয়ত বাপের বাড়ি থাকো।

দু'জনে প্রচণ্ড ঝগড়া হতে থাকে। বাপি, তাই দেখে হরিসাধনবাবুকে ডাকতে যায়, ভয় পেয়ে। এবং অমিয় নাগ চলে যায়। তখনই সোমনাথ তাকে দেখেছিল। সোমনাথ যখন এ বাড়িতে ঢুকেছিল, তখন ঝড়ের পর থমথম করছিল বাড়ি।

কিন্তু তার পরের এক বছরের মধ্যে কী করে যে সোমনাথ মালার স্বামী হয়ে

¯c‡ivMx

গেল, এটা সে আজও ভেবে তাজ্জব হয়ে যায়। সে কখনও ভাবেনি এটা। কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। সেদিন বিকেলের সেই ঘটনার পর, অমিয় নাগ একটা রটনা ছড়াতে খুব চেষ্টা করেছিল। বাপির গৃহশিক্ষকের সঙ্গে মালার পূর্ব প্রণয় ছিল। একটি মেয়ের সম্পর্কে, স্বামীবিযুক্তা মেয়ের সম্পর্কে এমন রটনা ছড়ানো খুব কঠিন নয় হয়তো। কিন্তু এক্ষেত্রে লোকের জানা ছিল অমিয় নাগের নিজের ব্যাপার-স্যাপার। আর সোমনাথকে প্রায় কেউই চিনত না তবু যারা চিনত তারা মানবে, যে সোমনাথকে হয়তো, একটু বিশেষভাবে লক্ষ করলে একরকম রূপবানই মনে হবে। কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব এত নরম, এতই সাধারণ হয়ে থাকে যে মালার দিকে যাওয়ার মতো সাহস তার হবে না। তাই এই রটনা কিছুদিন ঘুরে টাউনের রাস্তাতেই হারিয়ে গেল।

সোমনাথ সেই একইভাবে, সাইকেল টেনে টেনে হপ্তায় পাঁচ দিন বাপিকে পড়াতে যায়। একইভাবে কলেজে ক্লার্কের কাজ করে। বাপিও ওই প্রসঙ্গ তোলে না। সেও তোলে না। মালা বাড়িতেই থাকে। ওপরে। কোনও কথা হয় না তাদের। হয়তো সোমনাথ ঢুকছে ; মালা ছাদে। চোখে চোখ পড়লে সোমনাথ মাথা নামিয়ে নেয়।

হরিসাধন শুধু বুঝতে পেরেছিলেন আসল ব্যাপারটা। অর্থাৎ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর মেয়েকে বাঁচিয়েছে সোমনাথ। নইলে মা মরা মেয়েটা তাঁর জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যেত। তিনি সোমনাথকে নানাভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান। সোমনাথ গ্রহণ করে না। সোমনাথকে দেখতে দেখতে, ক্রমে, তার ওপর হরিসাধনবাবুর সত্যিকারের টান গিয়ে পড়ল। তিনি সোমনাথকে তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। সে পরে কী করতে চায় ? সোমনাথ বলতে পারত তার গানের কথা। কিন্তু সে কথা সে সবাইকে বলবে তা ভাবতেও পারে না। মাস্টারমশাইকে ছাড়া আর কাউকে বলার কথা ভাবতেও পারে না। মাস্টারমশাইকে সে নিজের গান শেখার কথা জিজ্ঞেস করবে ভেবেছিল, কিন্তু সেদিন বিকেলের সেই ঘটনার পর আবার তার ভেতর থেকে গান নিভে গেছে। মায়ের অসুখ, বাবার মৃত্যুর পর যাজ্ঞবল্ক্যর কঠিন কথা শুনে সে ঠিক করেছিল শিখবে গান। কিন্তু তার পরদিন বিকেল থেকে গান ছেড়ে গেল তাকে। তাই সে আর মাস্টারমশাইকে বলেনি শেখার কথা। মাস্টারমশাইয়ের কাছে গেলে এখন সে ওষুধ এনে দেয়। তাঁর কোনও কাজ থাকলে করে দেয়। শ্রীঅরবিন্দর কথা শোনে। মাস্টারমশাই কোনও গান একটু একটু গাইতে বললে সে শোনায়ও। কিন্তু নিজে, একা আর গান ভাবে না। করে না। কাজের সময়টুকু বাদ দিলে আড় হয়ে শুয়ে থাকে।

সোমনাথের মনে পড়ে অনেকদিন আগে একবার সে শৈল ঘোষালকে জিজ্ঞেস করেছিল, গান শুনে মানুষ কাঁদে কেন ?

শৈল ঘোষাল বলেছিলেন, আমাদের সব না-বলা কথা গান বলে দিচ্ছে বলে কাঁদি।

¯c‡ivMx

—না বলা কথা ?

—হ্যাঁ, যে-ভাষায় আমরা কথা বলি, নিজেকে প্রকাশ করি, সেটাই তো একমাত্র ভাষা নয় !

—নয় ?

—না। যেটুকু আমাদের সাধ্যের মধ্যে কুলোয়, বলতে পারি। বলে উঠতে পারি। বেশিটাই আমরা বলতে পারি না। এমন কি, কী কী আমরা বলতে পারছি না, তাও অনেক সময় বুঝি না আমরা। অথচ সে সবই ভেতরে জমা হয়ে থাকে। গান সমস্ত বলে দেয়।

—কী করে বলে ?

—সুরে পড়তে পড়তে বলে। যে-ভাষায় আমরা কথা বলি না, বলার কথা ভাবিও না, অথচ যে-ভাষায় আমরা কথা বললেও বলতে পারতাম, সেইটাই গানের ভাষা। গানের ভাষা মানে ভেতরকার ভাষা। গান সেই সমস্ত কথা, অনেক বোঝা, এমন কি না-বোঝা কথাও বলে দেয়। তাই আমরা কাঁদি।

সোমনাথ ভেবে অবাক হয়েছিল, তার বাবা 'বঙ্গ আমার' শুনে, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে' শুনে কাঁদত কেন তা হলে ? বাবা তো কোনও দিন স্বদেশী করেনি ! রাজনীতিও করেনি ! তা হলে ? আর ওগুলো শুনে সেই বা কেন কাঁদে ? সেও তো করেনি ওসব !

শৈল ঘোষাল বলেছিলেন, গান যে কার কোন তন্ত্রীতে আঘাত দেয়, বাইরে থেকে কি কেউ সেটা বলতে পারে ? মানুষ অনেক সময় নিজেও জানে না। তোমার বাবার হয়তো ছিল অমন কোনও তার। যেখানে ছোঁয়া লাগত। আর তুমি যে কাঁদো তা তোমার বাবার গাইবার স্মৃতি, ছোটবেলার স্মৃতি মনে আসে বলে হয়তো কাঁদো। তা ছাড়া সব কারণ কি জানা যায় ? ধরো 'প্রভাতে যারে নন্দে পাখি' এই গানটা শুনে, আমার চোখে জল আসে। এবার এইটা শোনো : না দির্ তা না দিন তা নোম্, তা নোম নোম, দে রে না-র না-র দে রে তোম, উ দা, না দির্ তা না দিম তা নোম...

তিন লাইন গেয়েই থেমে গেলেন মাস্টারমশাই। বললেন, এই শব্দগুলোর তো কোনও অর্থই পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই গানটাও যদি কেউ তেমনভাবে গাইতে পারে, চোখে জল আসবে।

—কেন মাস্টারমশাই ?

—ওই কেনটাই তো খুঁজতে হয় সারাজীবন। কোন কোন পর্দা যেমন তেমনভাবে এসে একটা গান তৈরি করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, সেটাই তো খুঁজতে খুঁজতে, বুঝতে বুঝতে সারাজীবন চলে যায়। প্রভাতে যারে নন্দে পাখি'র কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে বলেই কান্না আসছে, তা কিন্তু নয়। ওই আপাত অর্থহীন কতগুলো ধ্বনি থেকেও কান্না আসছে। কারণ, দুটোই এক সুর। একই রাগ।

—কী রাগ মাস্টারমশাই ?

¯c‡ivMx

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন শৈল ঘোষাল, সে কথা বলার অধিকার আমার নেই। যাঁরা রাগরাগিণী জানেন, তাঁরা বলবেন।

মাস্টারমশাইয়ের এই এক অদ্ভুত স্বভাব! হঠাৎ হঠাৎই সতর্ক হয়ে যেতেন। যেমন, মাস্টারমশাই, একবার, 'আজকাল আর সকালবেলা কল্যাণী যেতে পারি না' বলবার পরে, সোমনাথ জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল, কল্যাণীতে আপনি খাওয়ার জল আনতে যেতেন মাস্টারমশাই?

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের গলা বদলে গেল, মুখ কঠিন, কেন? তোমার কী দরকার?

সোমনাথ থতমত খেয়ে বলেছিল, না, মানে, সবাই বলে...

মাস্টারমশাই আরও গম্ভীর, কে বলে?

ব্যস্। সোমনাথ চুপ। আর কোনও দিনই জিজ্ঞেস করতে সাহস পায়নি। তবে এটা তো গানের ব্যাপার, তাই এ দিন সাহস করে বলেছিল, কেন মাস্টারমশাই, এই যে গাইলেন! কী সুন্দর! আমাকে একটু দেখিয়ে দিন না মাস্টারমশাই!

শৈল ঘোষাল টলেননি। রাগতভাবে বলেছিলেন, না। তোমাকে একদিন বলেছি না। অধিকার! সব অধিকার সবার থাকে না। রাগরাগিণীর বিষয়ে কথা বলার অধিকার আমার নেই। ভুল বলে ফেলতে পারি। ভুল শিখিয়ে ফেলতে পারি। তুমি বড় হয়ে অন্য কারও কাছে শিখে নিও।

সেই বড় হওয়া আর হল না সোমনাথের। সেই শেখা আর হল না। রাগরাগিণীর বাইরে বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল সে, চিরকাল। গাইল কতই। কিন্তু নাম জানল না।

সেদিন অবশ্য তারপরেই অন্য একটা কথা বলেছিলেন মাস্টারমশাই। বলেছিলেন, তবে হ্যাঁ। গান শুনে কাঁদবার অধিকার সকলেরই আছে। গোপনে বা সর্বসমক্ষে কাঁদবার অধিকার। হ্যাঁ, আছে, সকলেরই।

এখন কিছুকাল হল, গান থেকে কান্নাও বেরিয়ে আসে না আর সোমনাথের। ভেতরটা কেমন বন্ধ হয়ে আছে। বন্ধ আর অন্ধকার।. আকাশ থেকে সারাদিন ধরে যেন ঝুরঝুর করে ছাই ঝরে পড়ছে সেখানে। সেই অন্ধকারের ভেতর, সেই ছাইয়ের তলায়, চাপা পড়ে আছে তার নিভে যাওয়া গান।

সোমনাথ হরিসাধনকে বলল, তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা হল, বাপির এবছরে মাধ্যমিকটা হয়ে গেলে সে অপর একটি ছাত্র খুঁজে নেবে। তার অন্য ছাত্রটির পরীক্ষা দিতে এখনও বছর দুয়েক দেরি। হরিসাধনবাবু তাকে ব্যবসার অংশীদার করে নিতে চাইলেন—সোমনাথ রাজি হল না। বললেন, হাওড়ার অদূরে, তাঁর ভাইয়ের কারখানায়, অনেক বেশি মাইনেতে সে অ্যাকাউন্ট দেখার কাজ করবে কি না। কিন্তু সোমনাথ এই ছোট্ট জায়গা ছেড়ে কোথাও যাবে না। তার মা বাবাকে নিয়ে সে এখানে থেকেছে। সে এখানেই থাকবে।

¯c‡ivMx

যদিও তার নিজের কোনও জমি নেই। নিজের কোনও ভিটে নেই। তবু এই কচুরিপানা ঝোপজঙ্গল রিকশা কাদা গোবরভর্তি পুরো মফস্বল শহরটাকেই সে নিজের ভিটে মনে করে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। 'কো' অংশটি ঈষৎ অল্পভাবে উচ্চারিত হয়ে 'থা-আও' একটু দূরে গিয়ে দুলে ওঠে।

কেন আজ সে বোঝে। এমন জায়গা আর কোথাও নেই। এই তার দেশ। তার জন্মভূমি। একে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। তাকে অন্য কিছু বোঝানো যায় না। সব প্রস্তাবই সে ফিরিয়ে দেয়।

শেষে, হরিসাধন বললেন, মালাকে তুমি গ্রহণ করো সোমনাথ।

ইতিমধ্যে, অত্যধিক মূল্য দিয়ে তিনি অমিয় নাগের কাছ থেকে মালার ডিভোর্স কিনেছেন। এবং তাঁর একটি স্ট্রোক হয়ে গেছে। সেই সময়টায় তাঁর একমাত্র এবং মরিয়া ইচ্ছে ছিল, মেয়েকে অমিয় নাগের সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করা। তা তিনি পেরেছেন বটে। কিন্তু তারপর তিনি মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। যত দিন তিনি আছেন ঠিক আছে। মেয়েকে একটু একটু করে দু-একটা জিনিস শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছেন। কিছু কিছু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে সেই টাকা দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয় করে রাখছেন। আর খাটানোর দরকার নেই ব্যবসায়। মেয়ে যতটা পারবে, করবে। বরং এমন ভাবে রাখা যাক যে টাকা নিজেই বাড়বে। কিন্তু তিনি না থাকলে মেয়ে যদি কোনও বিপদে পড়ে।

এই যে ছেলেটিকে তিনি দেখছেন, পিতৃমাতৃহীন এই সোমনাথ, এ হয়তো উদ্যোগী নয়, কিন্তু এর কোনও লোভ নেই। পৃথিবী খুঁজলেও এরকম আরেকটি ছেলে তো তিনি পাবেন না। সাত চড়ে রা করে না। অথচ নিজের প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু তাকে দিয়ে নেওয়ানো যায় না।

অন্য দিকে, তার মেয়েকে কী বিপদ থেকেই না বাঁচিয়েছে। হরিসাধন জানেন, ভবিষ্যতেও বাঁচাবে নিশ্চয়ই। বাঁচাবেই। এমন ছেলেকে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু হরিসাধন ছেড়ে দিতে পারেন না বলেই তো আর সোমনাথ রাজি হতে পারে না। অচেনা কোনও মেয়ের সঙ্গে জীবন কাটানোর কথা সে ভাবতেও পারে না। আর তার চেনা মেয়ে কেউই নেই। সোমনাথ কাউকে বেশিক্ষণ না বলতে পারে না ঠিক কথা, কিন্তু পালাতে তো পারে।

সোমনাথ পালাল।

বাপিকে পড়াতে যাওয়া বন্ধ করল। কিন্তু দু'দিন কামাই করেই তার মনে হল ব্যাপারটা তো শৈল ঘোষালকে জানানো দরকার। কেননা, তিনিই তাঁকে বলেছিলেন ওকে পড়াতে। না জানিয়ে তো পড়ানো বন্ধ করা যায় না!

এক দুপুরে, সোমনাথ পৌঁছল শৈল ঘোষালের বাড়ি।

শৈল ঘোষাল এখন সারাদিন একা থাকেন। একটি কাজের লোক আছে।

¯c‡ivMx

ভাগনিদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। অবিবাহিত ভাগনেটির বদলির চাকরি। মাঝে মাঝে আসে। এই বাড়িতে শৈল ঘোষালের ভাইয়ের দুই ছেলের থাকার কথা। তারাও চাকরি নিয়ে বাইরে বাইরে। একতলাটা ভাড়া দিয়ে গেছে। বড় বাড়ি বেশ। ওপরে দুটো ঘর নিয়ে এখন শৈল ঘোষাল আছেন। ভাইয়ের ছেলেরা বছরে একবার আসে। কখনও দু'বছরে একবার। তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে, পড়াশোনার চাপ। শৈল ঘোষাল তার বাবার সূত্রে কিছু টাকা পেয়েছিলেন। তার সঙ্গে নিজে কিছু দিয়ে সোমনাথদের শহরে একটা বাড়ি কিনেছিলেন, সোমনাথের জন্মের বহু আগে। তারপর তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। বোনের বৈধব্য ঘটে। ভাগনে ভাগনিদের নিজের কাছে নিয়ে আসেন তিনি। রিটায়ার যখন করলেন তখন পি.এফ প্রায় কিছুই পেলেন না। সারাজীবন এত ঋণ নিয়েছেন! তাঁর রিটায়ারের দু'বছর আগে তাঁর বোন ক্যান্সারে মারা যান, তার বিপুল ব্যয় ছিল। তা ছাড়া ভাগনিদের বিয়ে দেওয়া তো আছেই। রিটায়ারের পর পরই বড় একটা অসুখ থেকে উঠে তিনি ঠিক করলেন, পৈতৃক ভিটেতেই ফিরে যাওয়া ভাল। বাড়ি বিক্রি করে তার টাকা রেখে দিয়েছেন ব্যাঙ্কে। সুদ পান কিছু প্রতি মাসে। সেইসঙ্গে পেনশন।

সোমনাথ ঘরে ঢুকে দেখল শৈল ঘোষাল বই পড়ছেন। শ্রীঅরবিন্দের বই।

—এসো। গত রবিবার আসোনি। শরীর খারাপ হয়নি তো!

—না মাস্টারমশাই। গত রবিবার হঠাৎ হরিসাধনবাবু এসে গেলেন বাড়িতে।

—ও। শৈল ঘোষাল জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

—তিনটে তো বাজে। আপনার চা খাওয়া হয়ে গেছে না!

—নাঃ। একা একা থাকলে পুরনো অভ্যেসগুলো বেশ বদলে যায়...

এই মানুষটা তো ধীরে ধীরে কম বদলাননি! ভাবে সোমনাথ। ওই সকর্মক দাপট। ওইরকম চলাফেরা। কিছুই আর নেই এখন। সেই, মুখ গম্ভীর করে চোখে হাসি নিয়ে চেয়ে থাকা মুছে গেছে কবেই। সকালে মর্নিংওয়াক করেন, কিন্তু একটুখানি। ছাদেই ঘুরে নেন কয়েকবার। হাঁপান তারপর।

আর গান? না গান আর নেই শৈল ঘোষালের সঙ্গে।

—চা করব, মাস্টারমশাই।

—হ্যাঁ করো।

কাজের মহিলাটি বারান্দার কোণের তক্তপোশে ঘুমচ্ছে। চা বানাতে তাকে ডাকার দরকার হয় না। সোমনাথ এসে নিজেই চা করে। অন্য সময় শৈল ঘোষালই বানান। চা-টা উনি নিজের ছাড়া একমাত্র সোমনাথের হাতেই খান বলে, মনে একটু প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে সোমনাথের।

চা নিয়ে ঘরে ঢুকে তাক থেকে বিস্কুটের কৌটো নামাল। মাস্টারমশাইয়ের প্লেটে দুটো দিয়ে এগিয়ে দিল চা। একসময় বাবার সঙ্গে সে গেলে শৈল

¯c‡ivMx

ঘোষাল চা বানিয়ে দিতেন তাদের। এখন সোমনাথ বানিয়ে দেয় শৈল ঘোষালকে। এখন বাবা যদি থাকত !

শৈল ঘোষাল চুমুক দিচ্ছেন চায়ে। সাগ্রহে তাকিয়ে আছে সোমনাথ। চা কেমন হয়েছে, সেটা সোমনাথ চুমুক দেবার পর শৈল ঘোষালের মুখের রেখা দেখেই বোঝে। জিজ্ঞেস করে না।

চা ঠিক হয়েছে কি না ভাবছ ? হ্যাঁ ঠিকই হয়েছে।

সোমনাথ ধরা পড়ে মুখ নামায়।

—তারপর ? হরিসাধনবাবুর প্রস্তাবের ব্যাপারে কী করবে ভাবছ নিশ্চয়ই ! সোমনাথ চমকে মুখ তোলে।

—হরিসাধনবাবু তোমার কাছে যাওয়ার আগে আমার কাছে এসেছিলেন। অন্তত তিনদিন।

সোমনাথ কিছু বুঝতে পারছে না।

—ওঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও।

সোমনাথের মাথায় বাজ পড়ল।

—শোনো। হরিসাধনবাবুকে আমি বহুদিনই চিনি। মৃতা স্ত্রীর বোনের ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন। বিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করতে পারতেন, সঙ্গতিও ছিল, কিন্তু করেননি।

সোমনাথ ভাবে, হরিসাধনবাবুর প্রতি মাস্টারমশাইয়ের দুর্বলতার এই কারণটা তো সে ভেবে দেখেনি।

তুমি বলনি, কিন্তু উনি আমাকে বলেছেন, কিছুকাল আগে, ওঁর মেয়েকে কীভাবে একটা বিপদ থেকে বাঁচিয়েছ তুমি। ...একমাত্র মেয়ে...তুমি না থাকলে...সর্বনাশ হয়ে যেত...উনি বারবার বলেছেন আমাকে। উনি এও বলেছেন যে তোমার কোনও লোভ নেই। হরিসাধনবাবুর কথা শুনে তোমার জন্য গর্ব হয়েছে আমার।

সোমনাথ আবার মাথা নামিয়ে নেয়।

শৈল ঘোষাল বলে চলেন, উনি বারবার বলেছেন তোমার কথা আর সেই সঙ্গে এও বলেছেন, যে, ওঁর মেয়ের ভবিষ্যত ভেবে উনি খুব চিন্তিত।

সোমনাথ হঠাৎ যেন কথা খুঁজে পায়, বলে, তার জন্য আমাকে ... মানে আমি ... আমাকে রাজি হতে বলছেন কেন আপনি ?

—বলছি, তোমার ভবিষ্যৎ ভেবে আমি চিন্তিত বলে। তার আগে বলো মেয়েটিকে কি তোমার পছন্দ নয় ?

—না না, সেসব কথা নয়।

কোনও মতে এইটুকু বলে সোমনাথ। এভাবে কখনও ভাবেনি।

শৈল ঘোষাল বলেন। তবে তোমার মনোমতো অন্য কোনও মেয়ে কি আছে ?

—না না ! তা নয়। ... তা নয় ...

¯c‡ivMx

—তা হলে কি এই মেয়েটির আগে একবার বিয়ে হয়েছে বলে তোমার আপত্তি ?

সোমনাথ এবার মরিয়া হয়ে বলে, এসব কিছু নয় আসলে, অচেনা একটি মেয়ের সঙ্গে জীবন কাটানোর কথা আমি ভাবতে পারি না মাস্টারমশাই !

শৈল ঘোষাল হাসেন, অচেনা কে নয় ? অচেনা তো আমরা সবাই ছিলাম। একটু একটু করে চেনা হয়ে যাবে। ভয় কীসের। সবারই তাই হয়। আর শোনো, এই কম বয়সে একা থাকা, সেটা একরকম। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে একা থাকা কঠিন, মাঝে মাঝে দুর্বিষহ সেটা। বহন করা যায় না নিজেকে। সেই সময়টার কথা ভাবো। তা ছাড়া বাবা মাকে হারিয়ে তুমি আঘাত পেয়েছ, তোমার ভেতরে অনেকটা জায়গা খালি আছে। ওই মেয়েটিও আঘাত পেয়েছে তার স্বামীর কাছ থেকে। ভালবেসে বিয়ে করেছিল তো। তার ভেতরটা খালি অনেক। সেইজন্যেই না কেউ নিজে নিজে মরতে যায় ...দেখো, তোমাদের দুজনেরই দুজনকে দরকার !

সোমনাথ বলে, আমার তো বাড়িঘর নেই। ওইটুকু ঘরে ভাড়া থাকি। কোথায় এসে উঠবে মেয়েটি ?

—তুমিই থাকবে ওদের বাড়ি। হরিসাধনবাবু সেটাই চেয়েছেন। তোমারও ভবিষ্যত অনেকটা নিরাপদ হবে এতে। আমি তোমাকে বলছি এতে অসম্মানকর কিছু নেই। তোমার বাবা নেই। এখন তোমার ভালমন্দ নিয়ে ভাবা তো আমার দরকার ! আমার মনে হয় তোমার রাজি হওয়া উচিত।

সোমনাথ মুখ নিচু করে বসে রইল।

—হরিসাধনবাবু সামনের মঙ্গলবার আমার কাছে আসবেন। আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই উনি তোমার কাছে গিয়েছিলেন। আমার কাছেই আসবেন তোমার সিদ্ধান্ত জানতে। তুমি রাজি থাকলে আমি ওঁকে জানিয়ে দেব।

সোমনাথ তেমনই বসে রইল।

—তুমি কি 'না' বলবে সোমনাথ ? ইচ্ছে করলে বলতে পারো। আমি কিছু মনে করব না। আসলে এটা তো তোমার জীবনের ব্যাপার। সিদ্ধান্ত তুমিই নেবে।

সোমনাথ কিছু বলল না এখনও। সে বেশিক্ষণ কাউকেই না বলতে পারে না। মাস্টারমশাইকে তো একবারও পারে না।

হঠাৎ মুখ তুলে সোমনাথ বলে, কিন্তু মেয়েটি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন !

—হবে। হবে না, হয়েছে। রাজি হয়েছে।

ধক করে উঠল সোমনাথের বুক। মেয়েটি আগেই রাজি হয়েছে ! তার মনে পড়ল ছাদে দাঁড়ানো মেয়েটির চোখ অন্যদিকে সরে গেল। সোমনাথের ভেতরে একটা চাঞ্চল্য জাগল। একটা মেয়ে রাজি হয়েছে তাকে বিয়ে করতে !

¯c‡ivMx

সোমনাথকে পড়তে পারেন শৈল ঘোষাল। বললেন তবে শোনো, একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে তোমাকে।

—প্রতিশ্রুতি ?

—হ্যাঁ। আর আমার কাছে দিতে হবে সেটা।

—কী প্রতিশ্রুতি, বলুন মাস্টারমশাই !

—একে বিয়ে করার পর তুমি অন্য কোনও মহিলার কাছে যাবে না কখনও।

—অন্য কোনও মেয়েকে আমি চিনি না মাস্টারমশাই !

—আমি জানি। কিন্তু বুঝতে পারো তো ওই মেয়েটির জীবনে আগে ঠিক ওইরকম ঘটনা ঘটেছে বলেই ভয় পাচ্ছে বেচারি। তোমাকে অবশ্য আমি জানি।

বলে, চুপ করে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন শৈল ঘোষাল। তারপর বললেন, তবে জীবন তো বড় অনিশ্চিত। জীবনে যে কত কিছুই হয়। তাই বলে রাখা... হরিসাধনবাবু অনেক কষ্ট করেছেন, তারপর প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। অন্যের সন্তানকে মানুষ করেছেন। সেই মানুষ যদি নিজের সন্তানের জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে মরে ... সেটা কি ভাল ? ...বলো, সেটা কি ভাল ?

সোমনাথ নিজের বাবার কথা ভাবল।

সোমনাথ নিজের মায়ের কথা ভাবল।

তাঁরা কি সোমনাথের জন্য দুশ্চিন্তা নিয়ে মরেছিলেন ?

বাবা যখন যায় সোমনাথ তখন চাকরি করছে। বাবা বলত মাস্টারমশাইয়ের কাছে কাছে থাকবে। আমরা থাকি না থাকি, মাস্টারমশাইয়ের কথা শুনে চলবে।

সোমনাথ শুনল। মাস্টারমশাইয়ের কথা।

সোমনাথের বিয়েতে অবশ্য শৈল ঘোষাল আসতে পারেননি। অসুস্থ শরীর তাঁর। ধকল না নেওয়াই ভাল। যাজ্ঞবল্ক্যও আসেনি। সে তখন লায়েক হতে শুরু করেছে। কলকাতার নামী পাবলিশিং অফিসে চাকরি পেয়ে সে তখন গ্রাম ছাড়া। এসেছিলেন সৌমেন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠান প্রায় কিছুই হল না। বাড়িতে রেজিস্টার ডেকে সইসাবুদ মাত্র। হরিসাধনবাবুর মেয়েরই নাকি আপত্তি ছিল অনুষ্ঠান করায়। আগেরবার খুব ধুমধাম হয়েছিল তো। সোমনাথকে ব্যাপারটা বলেও নিয়েছিলেন হরিসাধনবাবু। সোমনাথের মত প্রকাশ করার অভ্যেস নেই। তা ছাড়া সে বিবাহ অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবেওনি। সোমনাথ শুধু বলেছিল বাপির পরীক্ষার পর এসব করলে হয় না।

কিন্তু বাপির পরীক্ষার তখনও মাস আটেকের দেরি। হরিসাধন অপেক্ষা করতে চাইলেন না। তিন মাস পরে ঠিক হল এই দিন। এই তিন মাস সোমনাথ বিকেলে আগের মতোই সাইকেল নিয়ে গেল পড়াতে। কখনও

¯c‡ivMx

কখনও চোখ পড়ল ছাদে বা বারান্দায়। সোমনাথ আগের মতোই চোখ নামিয়ে নিল। কথা বলল না কেউই।

সোমনাথ শুধু মাঝে মাঝে ভাবল, এই তিন, মাস মাঝে মাঝে ভেবে কেমন যেন হয়ে গেল—রাজি হয়েছে, একটা মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে তাকে!

বিয়ের দিন সন্ধের ট্রেনে সৌমেন চক্রবর্তীকে তুলে দিয়ে এসে বাপির ঘরে ঢুকে তার বইখাতা নিয়েও বসল সোমনাথ। বাপির অন্য শিক্ষকও আছে। বাপি নিয়মিত কোচিং-এ যায়। তবু সে সময় একটু বসে রোজই। মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকে সে এই দায়িত্ব পেয়েছে কি না।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর, বাপির দিদি তাকে শুতে পাঠিয়ে দিল। যে এই বিয়ে উপলক্ষেই নিকটবর্তী শ্বশুরবাড়ি থেকে এখানে এসেছে। সোমনাথ ঘরে গিয়ে দেখল মালা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে একটা নেল কাটার দিয়ে নখ ঘষছে। তাকে চোখ তুলে একবার দেখে আবার নখ ঘষতে ঘষতে বলল, বসুন। আপনার সঙ্গে দু-একটা দরকারি কথা আছে।

সোমনাথ কী বলবে ভেবে পেল না। দাঁড়িয়ে রইল।

মালা বেশ স্নিগ্ধ। নাকটা খাড়া। গায়ের রঙ শ্যামলা।

সোমনাথ ভাবল, এই মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এই মেয়েটি বিয়ে করতে রাজি হয়েছে তাকে।

—কী হল বসুন। বসতে বললাম যে!

সোমনাথ বসল। গলার স্বর কি একটু রুক্ষ?

মালা খুব শান্তভাবে বলল, নখ ঘষতে ঘষতেই বলল, —এই বিয়েটা যে হবে আমি ভাবিনি।

সোমনাথ অবাক।

—বিয়েটা কেন হল বলুন তো? জানেন?

সোমনাথ চেয়ে আছে।

—বিয়েটা হল আমি রাজি হলাম বলে। আমি কেন রাজি হলাম বলুন তো?

সোমনাথ চেয়ে আছে।

—বাবা বলল, একটা বিয়ে তুমি নিজের ইচ্ছেয় করেছিলে। এই বিয়েটা আমার ইচ্ছেয় করো। করতে হবে তোমাকে। তাই রাজি হলাম।

সোমনাথ কিছু বুঝতে পারছে না।

—সত্যিই আগের বিয়েটায় বাবার মত ছিল না। আমার জেদের জন্য বাবাকে রাজি হতে হয়েছিল। এবার বাবা বলল, সারাজীবন তো আমার একটা ইচ্ছেও রাখোনি। এটা রাখো। সত্যিই বাবার একটা কথাও শুনিনি কখনও। এটা শুনলাম।

সোমনাথের যেন ঠিক ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না সবটা। মালা বিছানায় উঠল। প্রথমে বসল খাটে, তারপর শাড়িপরা পায়ের পাতা দুটো কী সুন্দরভাবে

¯c‡ivMx

একযোগে উঠে গেল বিছানায়। একটা জানলা ঢকঢক করছিল বিছানার পাশে, হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে ভাল করে খুলে ছিটকিনি আটকে দিল। টেবিল থেকে একটা শিশি খুলে ক্রীম মাখতে লাগল মুখে।

—বাবা অবশ্য আপনি বলতে অজ্ঞান। সেদিন আমাকে দেশলাই জ্বালতে দেননি বলে। কেন দেননি বলুন তো! খুব অন্যায় করেছিলেন!

এতক্ষণে সোমনাথ বলতে পারল, অন্যায়?

—নয়তো কী। আমি সেদিন গায়ে আগুন দিয়ে মরলে পাবলিক অমিয় নাগকে দায়ী করত। পুলিশ ধরত ওকে। আমার ঘরে আমি লিখেও রেখেছিলাম ওর নাম। ওই মেয়েটাকেও ছাড়ত না। ওর নামও লিখে রেখেছিলাম। ওকেও ধরত। হ্যাঁ, ঠিক, অমিয় নাগের অনেক চেনাজানা। ওকে আটকে রাখতে হয়তো পারত না। কেটে বেরিয়ে যেত। কিন্তু লোকে তো বিশ্বাস করত অমিয় নাগ নিজের বউকে পুড়িয়ে মেরেছে। সে ব্যবস্থা আমি পাকা করে রেখেছিলাম। আর যে লোক নিজের বউকে পুড়িয়ে মেরেছে, কোনও মেয়ে আসতে আর সাহস করত না তার কাছে। ভয় পেত। ঘেন্না করত। ঠিক শাস্তি হত ওর। নতুন নতুন মেয়ে ছাড়া ও থাকতে পারে না।

মালা কথা শেষ করে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল সোমনাথের দিকে। বলল, কোত্থেকে যে হঠাৎ উটকোর মতো এসে পড়লেন আপনি। আমার শোধ নেওয়াটা হল না।

মালা উঠে পাশের কলঘরে গেল। জল পড়ার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। সোমনাথ দেখছে খাটের উপর মশারি খাটানোর স্ট্যান্ডে ঝুলছে রজনীগন্ধা আর বেলফুল। গন্ধে ভরে আছে ঘর। নতুন বেডকভার পাতা বিছানায়। নরম আলো ঘরে।

এই মেয়েটি তা হলে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। তার বাবার কথায় সম্মতি দিয়েছে মাত্র।

মালা ঘরে এল। একটা ওষুধের উপর পা তুলে পায়ের পাতাটা তোয়ালে দিয়ে মুছছে। সোমনাথ চোখ সরিয়ে নিল।

—আর বাবারও বলিহারি। হাতে পায়ে ধরে ডিভোর্সটা নিল। অত অর্থদণ্ড দিয়ে। আমি দিতাম না। সারাজীবন ডিভোর্স দিতাম না আমি। মুক্তি দিতাম না ওকে। আমাকে বঞ্চিত করে আর একজনের সঙ্গে থাকবে? অত সোজা? বাবাকে বললাম মামলা লড়ো। বাবা লড়ল না। বাবার জন্যই হল এসব।

হঠাৎ মালা তার দিকে ঘুরে বলল, আচ্ছা আপনি যখন দেখলেন, আমি গায়ে কেরোসিন ঢালছি, আপনি চুপচাপ পালিয়ে গেলেন না কেন? পালিয়ে যেতে তো পারতেন? হ্যাঁ।

সোমনাথ কোনওমতে বলল, পুড়ে গেলে দারুণ কষ্ট। জ্বালাপোড়ার কষ্ট তো... খুব... আপনি... জানেন না!

¯c‡ivMx

ফুঁসে উঠল মালা, কীসের কষ্ট, জ্বালাপোড়ার ?

তার চেয়ে এখন যে দিনরাত্রি জ্বলছি, এই পোড়ার জ্বালা কম ! হ্যাঁ ? সে তো একবারে চুকেবুকে যেত। কেন এলেন আপনি ?

সোমনাথ মুখ নামিয়ে বসে রইল।

—কেন এলেন অবশ্য জানি।

সোমনাথ মুখ তুলল।

—তবে একটা কথা বলি, বিয়ের কথাটা বাবার কাছে না বলে আমাকে বলতে পারলেন না ? হ্যাঁ ? কী আর হত ! খুব বেশি হলে আমি না বলতাম। হ্যাঁ, না-ই বলতাম ! তার বেশি আর কী হত ! এটুকু সাহস নেই ! নিজে বলার !

অমিয় নাগ হলে কিন্তু এমন করত না। করেওনি। সরাসরি আমাকেই বলেছিল। তিনদিনের আলাপে। হ্যাঁ। তিনদিন।

আর একটা কথা। বিয়ে হয়েছে, ঠিক আছে কিন্তু একটা কড়ার আছে আমার। শর্ত। আমার কাছে শর্ত করতে হবে।

সোমনাথ তাকাল। মালার নাকে ঘাম। মুখ লালচে হয়ে উঠেছে। মালা বলে, অন্য কোনও মেয়ের কাছে যাওয়া চলবে না।

সোমনাথ ধীরে ধীরে বলে, অন্য কোনও মেয়েকে আমি চিনি না।

মালা অবাক, অন্য কোনও মেয়েকে চেনেন না মানে ! কোনও মেয়ের সঙ্গে জানাশোনা নেই ?

—না।

—কীরকম পুরুষমানুষ আপনি ? প্রেম ট্রেম হোক না হোক, কোনও মেয়েকে মনে ধরেনি কখনও ? পছন্দ হয়নি ?

এরকম কথা শুনতে সোমনাথ অভ্যস্ত নয়। কী বলবে, কী বলতে হয় সে জানে না। তার কান ঝাঁঝাঁ করতে থাকে। মুখ নামিয়ে, চোখ বুজে ফেলে সোমনাথ।

সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে ভেসে ওঠে একটা রেকর্ডের কভার। কভার থেকে তাকিয়ে আছে দুটো স্মিত চোখ। শান্ত মুখ। থুতনির পাশে একটা আঁচিল।

তৃষ্ণা চৌধুরী।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলে ফেলে সোমনাথ। শোনে, মালা বলছে, জানাশোনা থাকুক আর না থাকুক, ভবিষ্যতে কখনও, কোনও মেয়ের কাছে গেলে কিন্তু এ বাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ বাড়িতে আর থাকা চলবে না। মনে রাখবেন, এই বাড়ি, জমি, সব এখনও আমার নামে।

সোমনাথ আর পারছে না। উঠে পড়ল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সোমনাথ।

—কোথায় যাচ্ছেন ?

দরজার বাইরে বারান্দায় এসে এই কথাটা শুনে থমকে গেল সে। কোথায়

¯c‡ivMx

যাচ্ছে, সে ? এখন এই রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে সে ! সামনে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে। উঠতে লাগল সে কোনও কিছু না ভেবেই। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে উঠে সে একটা দরজায় ঠেকল। হাতড়ে হাতড়ে খুলল খিল। ছাদ। ছাদে এসে দাঁড়াল সে।

এই সেই ছাদ। যেখানে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে। এই ছাদের এই জায়গাটাতেই, এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই আট বছর আগের রাত্রিবেলা। তার চোখ জ্বালা করছিল। কিন্তু জল আসছিল না। আকাশ দিয়ে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছিল। হাওয়া আসছিল দক্ষিণদিক থেকে। তার মনে পড়ছিল, ওইদিকেই, ওই দূর দক্ষিণে, তার সদ্য ছেড়ে আসা ভাড়া বাড়ি। আজ রাত্রে বেরিয়ে গেলে তার থাকার জায়গা নেই।

মাস্টারমশাই মাস্টারমশাই এসব কথা আমি আপনাকে বলব কী করে ?

অথচ এখানে আমি থাকবই বা কি করে মাস্টারমশাই ?

পিছনে খস খস শব্দ হল একটা। কীসের যেন সুগন্ধ এল নাকে। সোমনাথ ঘুরল না।

—ঘরে চলুন।

সোমনাথ ঘুরল না, ধীরে ধীরে বলল, সম্পত্তির জন্য আপনাকে বিয়ে করিনি আমি। আপনার বাবাই বিয়ের কথাটা বলেছিলেন আমাকে। আমি বলিনি।

—আচ্ছা, ঠিক আছে। ঘরে চলুন।

—আমি সে প্রস্তাবে না বলেছিলাম।

—'না' বলেছিলেন ?

—হ্যাঁ। আমি রাজি হইনি।

—পরে হ্যাঁ বললেন কেন !

—আমার মাস্টারমশাই বললেন, তাই।

—মাস্টারমশাই ?

—শৈল ঘোষাল। আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার। উনি চেয়েছিলেন তাই আমি রাজি হলাম। ওঁর কথাতেই বাপিকে আমি পড়াই।

—ওঃ। আচ্ছা। আমি জানতাম না।

—আপনার বাবা জানেন। তাঁকে জিগ্যেস করবেন।

—বাবাকে জিগ্যেস করার দরকার নেই আমার। যাক। ঘরে চলুন।

—সম্পত্তির জন্য আপনাকে বিয়ে করিনি আমি।

—পুরুষমানুষরা যে কীসের জন্য বিয়ে করে, তারাই জানে। মেয়েদের কষ্ট দেবার জন্যই করে বোধহয়। যাক গে, আমি গেলাম। ইচ্ছে হলে ঘরে আসবেন। দরজা ভেজানো রইল।

সোমনাথের ইচ্ছে হয়নি। সারা রাত ছাদেই ছিল। আজকেরই মতো। এদিক থেকে ওদিক ধীরে ধীরে পায়চারি করেছে। তারপরে ছাদের এক ধারে ছোট একটা বেদি আবিষ্কার করে তাতে বসেছে। এক সময় আধশোয়া হয়ে

¯c‡ivMx

ঘুমিয়েও পড়েছে কখন। এইভাবে কেটে গেছে তার বিবাহরাত। সকালের রোদ মুখে পড়ে ঘুম ভাঙতে সে দেখেছে, স্নান করে কাপড় মেলতে এসে তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বাপির দিদি। বলেছে, এখানে ছিলেন নাকি সারা রাত ? সোমনাথ হ্যাঁ বলায়, মুখ গম্ভীর করে নেমে গেছে।

সেই দিনই সকালবেলা বাপির জামাইবাবু এসে পড়ল। রঞ্জিত। বাপির দিদিকে নিয়ে ফিরে যাবে সে। পর দিন সকালে রওনা দেবে তারা। রঞ্জিত প্রস্তাব দিল আজ সন্ধেয় সবাইকে সিনেমা যেতে হবে। দুপুরের খাবার সময় কথা চলছে। সোমনাথ খেয়ে চলেছে। রঞ্জিত বলল, সোমনাথদা যাবেন তো।

সোমনাথ বলল, বাপিকে সন্ধেবেলা আমি তো...

বাপির দিদি বলল, ও একটা দিন একা পড়ে নেবে ! মালা বলল, রোজই তো পড়াচ্ছ বাবা ! চলো না আজ !

সোমনাথের মাথাটা ঝন ঝন করে উঠল। এই প্রথম কোনও মেয়ে তাকে তুমি বলল। চলো না আজ। রোজই তো পড়াচ্ছ বাবা ! কে বলবে কাল রাত্রে কী ঘটেছে। তারা যেন রোজই এভাবে কথা বলে।

সন্ধেবেলা সিনেমা হলে, তারা চারজন পাশাপাশি। ছবি শুরু হতে পর্দায় তাকিয়ে আছে সোমনাথ। ছবির দিকে মন নেই। সে ভাবছে গত রাত্রের কথা। হঠাৎ তার হাতের উপর নরম একটা স্পর্শ। চমকে উঠে বুঝতে পারল সোমনাথ, হাতটা মালার। তার আঙুল নিয়ে খেলছে। সোমনাথ, স্পর্শ ফেরত দিতে পারল না। হাতটা সরে গেল। ইন্টারভ্যালের পর আবার হাতটা এল তার হাতে। ফিরেও গেল আবার।

রাতে খাওয়ার পর ছাদে উঠে এল সোমনাথ। এখানে এই দু' দিনের ব্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তার মন পালাই পালাই করছে কিন্তু কোথায় পালাবে সে। ছাদে পায়চারি করতে করতেই পিছনে সেই খস খস আওয়াজ। মালা।

আজ রাত্তিরেও ছাদে থাকবে নাকি !

সোমনাথ চুপ।

—চলো। ঘরে চলো। আমাকে শিউলি বলেছে সোমনাথদা কাল সারারাত ছাদে শুয়েছিল কেন রে। প্রথম দিনই ঝগড়া করেছিস। আমার মুখ দেখানোর উপায় রইল না চলো।

ঘরে এসেই সোমনাথ আবার অপ্রত্যাশিতের মুখোমুখি হল। মালা সোমনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, রাগ করেছ ? সোমনাথ চুপ। কী বলবে সে জানে না। সোমনাথের হাতটা ধরল মালা, বলল, রাগ করে আছ, না ? আমার ওপর ?

সোমনাথ বলল, না তো !

—তাহলে, সিনেমা হলে যখন হাত ধরলাম তুমি অমন আড়ষ্ট হয়ে রইলে

¯c‡ivMx

কেন ?

সোমনাথ বলতে পারল না, কোনও মেয়ে তো কখনও আমার হাত ধরেনি। হাত ধরলে কী করা উচিত আমি জানতাম না।

—জানি রাগ করে আছ। কাল কত বকেছ আমাকে !

সোমনাথ বলে, বকিনি তো।

—হ্যাঁ বকেছ। খুব বকেছ। বলতে বলতে মালা শার্টের বোতাম খুলে সোমনাথের বুকে মুখ রাখে।

শরীর শিউরে ওঠে সোমনাথের। দু' হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে নিয়েছে মালা। হাত খেলে বেড়াচ্ছে সোমনাথের পিঠে। সোমনাথের শরীরে আগুন ধরতে শুরু করল। তার বুকে মুখ ঘষছে মালা। খুব রাগ করেছ, না। খুব না ! হ্যাঁ...চুলের মুঠি ধরে সোমনাথের মুখ নিজের দিকে নামিয়ে আনে মালা। সোমনাথ চুম্বনাবদ্ধ হয় জীবনে প্রথমবার। সোমনাথের শরীর জেগে উঠছে বুঝতে পেরে আরও অস্থির হয়ে ওঠে মালা। তারা পরস্পরকে আঁকড়াতে আঁকড়াতে ভারসাম্য হারিয়ে গড়িয়ে পড়ে বিছানায়, সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথের মনে ফিরে আসে কেরোসিনের গন্ধ। উঃ কী কেরোসিনের গন্ধ। সোমনাথ দেখে আধ বোঁজা চোখের মালা, ঠোঁট অর্ধেক খোলা, মালা যদিও বলছে, নিভিয়ে দাও, বেডসুইচটা, নিভিয়ে...কিন্তু সোমনাথ শোনে, ছাড়ুন না, দেশলাইটা, ছে-ড়ে-দি-ন, সোমনাথের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই শেষ বিকেলের একটা রান্নাঘর। কেরোসিন ভেজা মেঝে, যেখানে সে দেশলাই কেড়ে নিচ্ছিল, যেখানে তার শরীরের নীচে ছিল মালা। এক মুহূর্তে সোমনাথ কাঠিন্য হারায়। গা গুলিয়ে ওঠে তার। মালা বাধা পায়। ধীরে ধীরে মালার সম্বিত আসে।

বলে, কী হল ?

সোমনাথ উঠে বসে। সোমনাথের চোখে ভাসছে এখনও সেই অর্ধেক মূর্ছিতা নারী। যার ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা। যে নারীর শরীরভরা কেরোসিনের গন্ধ।

সোমনাথ বলে, আমি ছাদে যাব।

মালা ওঠে। বলে, যাও।

খাট থেকে নেমে জলের জগ ওঠায় মালা। গেলাসে ঢালে। বলে, সারারাত ছাদেই থেকো, নীচে আসার আর দরকার নেই।

তারপর জল খায়।

সোমনাথ বলে, জগটা নেব আমি।

—নাও।

জলের জগটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পায় সোমনাথ, অমিয় নাগ, আর যাই হোক অন্তত পুরুষ ছিল। সেদিকে তার খুঁত ছিল না।

সেইদিন থেকে সে অমিয় নাগকে ভুলতে পারেনি সারাজীবন।

¯c‡ivMx

সেই রাত্তিরটাও ছাদেই কাটায় সোমনাথ। আজকের মতোই ভরা গ্রীষ্মের রাত। যেসব রাত তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যায়। আজকের রাত্তিরও শেষ হতে বেশি দেরি নেই। হাওয়ায় শেষ রাতের গন্ধটা ভেসে আসতে শুরু করেছে, বেশ টের পায় সোমনাথ। একটু পরেই এই গন্ধটা ভোরের গন্ধে বদলে যাবে। সোমনাথের ধারণা রোদ ওঠার আগে ভোরের একরকম গন্ধ। রোদ আসার পরে আরেক রকম। গন্ধের নাকটা বরাবরই বড় প্রখর সোমনাথের। বড় সূক্ষ্ম। হাওয়ায় এখুনি ভোরের গন্ধ আসতে শুরু করবে, তার আগে একটু শুয়ে নেওয়া ভাল। নীচে যাওয়া যাক। সোমনাথের শোবার ঘরে। শোয়ার জায়গাটা তাদের দু'জনের প্রথম থেকেই আলাদা। সেই বিয়ের পর প্রথম দুটো রাতের পর থেকেই। তারা আলাদা শোয়। নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে ভাবল সোমনাথ, কী আর করবে সে! মালার শরীরের কাছে এলেই যে সে চিরকালই একটা কেরোসিনের গন্ধ পায়। তীব্র কেরোসিনের গন্ধ! তার সব চলে যায় সঙ্গে সঙ্গেই।

কী করবে সে!

৮

অস্পষ্ট একটা শব্দ শুনে বিছানায় উঠে বসল সোমনাথ। সকাল বেশ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আলো ঝকঝক করছে চারদিকে। জানলায় একটা ফর্সা হাত, পর্দাটা সরানোর চেষ্টা করছে বাইরে থেকে। জানলার পিছনেই একটা বারান্দা।

সোমনাথ উঠে দরজা খুলে বারান্দায় এসে দেখল, রুমা, হাতে চায়ের কাপ।

—এ মা, আপনি কাল নীচের দরজা লাগাননি?

—লাগাইনি? সোমনাথ মনে করতে পারে না।

—লাগালে আমি এলাম কী করে? মাকে দিয়ে বলে পাঠালাম, তাও দরজা দিলেন না, ছিঃ ছিঃ, যদি সব চুরি হয়ে যেত!

—তুমি আবার চা আনতে গেলে কেন!

—আনলাম। ইচ্ছে হল, তাই। ভাবছি আপনি আজকে গান গাইছেন না কেন, গান হলে, তবে চা নিয়ে যাব। তারপর দেখি সাতটা বেজে গেল। আমাকে তো আবার পড়তে যেতে হবে, তাই চলে এলাম।

—নিন, চা নিন।

সোমনাথ বারান্দার পাশে বেসিনে দাঁড়িয়ে মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলল, তুমি চা খাবে না?

—এই তো খেলাম এক্ষুনি। কিন্তু আমি ভাবছি, কী কাণ্ড! যদি রাত্তিরে চোর ঢুকত! কাকিমা কবে ফিরবেন।

¯c‡ivMx

—দু' একদিনের মধ্যেই।

তাক থেকে তোয়ালে নামায় সোমনাথ।

রুমা বলে, আমি কাকিমাকে বলব আপনাকে আর একা রেখে না যেতে। কী রকম আনমনা আপনি। কাকিমা শুনলে কী বলবেন।

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিতে নিতে বলে সোমনাথ, শোনো, তোমার কাকিমাকে এসব বলার কোনও দরকার নেই!

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি, কাকিমাকে আপনি খুব ভয় পান, না! কাকিমাকে কিন্তু আমার খুব ভাল লাগে। কী দাপট। একা একা কত কাজ করেন। অত সব জমি জায়গা দ্যাখেন। একজন মেয়ে হয়ে... সত্যি, আমার দারুণ লাগে।

মালা, এই সাত-আট বছরে হরিসাধনবাবুর ব্যবসাপত্র কিছু বিক্রি করে দিয়েছে। কিছু রেখেছে। বাড়িগুলোর ভাড়া আদায়, ভাড়াটে উচ্ছেদ, বাড়ি সংস্কার করা। ধানের জমির খবর নেওয়া। এ সবই করে চলেছে। মাঝে মাঝে কোর্টে গিয়ে উকিল মোক্তার করে। কিছুকাল আগে তাদের কলেজের কাছাকাছি একটা নতুন বাড়ি বানিয়েছে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে।

মালা, যা করার নিজেই করে।

রুমা বলে, কাকু, আপনি কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন, না?

সোমনাথ সচকিত, তুমি কী করে জানলে?

—কী করছিলেন অত রাত্রে। ঘুম আসছিল না!

—এই একটু পায়চারি করছিলাম। কিন্তু সে তো অনেক রাত।

—আমি জানলা থেকে দেখলাম। ছাদে আপনি। জ্যোৎস্না পড়েছিল। আপনার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু আপনার দাঁড়ানোর ধরনটা তো আমি চিনি।

—তুমি অত রাতে জেগে ছিলে কেন!

—ঘুম আসছিল না। আমি চুপিচুপি দরজা খুললাম যাতে শব্দ না হয়। তারপর বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম আপনি আমাদের বাড়ির দিকের আলসের উপর হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। আমি ভাবলাম, আমি তো বারান্দায়। আপনি কি আমাকে দেখতে পাবেন!

—আমি দেখতে পাইনি।

—আপনি দেখতে পেলেন না। আমি ভাবলাম, আপনি কি একটা গান গাইবেন। আমি বসে রইলাম। আপনি গান গাইলেন না। তারপর আপনি ওদিকটায় চলে গেলেন। দাঁড়ালেন। ওই দূরের দিকটায় দক্ষিণের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার ফিরলেন। আমি উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। যদি আপনি আমায় দেখতে পান। আপনি দেখতে পেলেন না। আমি দেখছি আপনার ছায়া একবার দেখা যাচ্ছে, তারপরই আর দেখা যাচ্ছে না, আবার ওদিকটায় দেখা যাচ্ছে।

¯c‡ivMx

—আমি পায়চারি করছিলাম।

—বুঝতে পারলাম সেটা। তারপর হঠাৎ মনে হল আপনাকে ডাকি। কিন্তু ডাকলে তো ওদের ঘুম ভেঙে যাবে। ডাকতে পারছি না। উঠোনে বেরিয়ে হঠাৎ দেখলাম, নীচের দরজাটা খোলা। ভাবলাম উঠে যাই। ছাদে। আপনার কাছে।

—সেকী!

—তখন রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি গিয়ে আমাদের দরজাটা বন্ধ করে, বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলাম। যাতে হাওয়ায় শব্দ না করে, তারপর পা টিপে টিপে উঠে গেলাম ছাদে!

সোমনাথ, আশ্চর্য হতেও ভুলে যায়। বলে, —ছাদে, কই, দেখিনি তো!

রুমা একটু চুপ করে থাকে। তারপর, আগের রাতের রেখে যাওয়া, জানলার ধারে দাঁড় করানো মোমবাতিটার গা থেকে খুঁটে-খুঁটে মোম তুলতে তুলতে বলে, আমিও কাউকে দেখিনি!

সোমনাথ বলে, কিন্তু আমি তো ছিলাম ছাদে। প্রায় সারারাত ছিলাম!

রুমার গলা ভার হয়ে আসে, ছিলেন। কিন্তু প্রায় সারারাত ছিলেন। পুরো রাতটা ছিলেন না। আমি যাবার ঠিক আগেই হয়তো নেমে গেছেন আপনি। দরজাটায় খুব আস্তে শিকল তুলতে গিয়ে যে দেরিটুকু হয়েছিল, সেইটুকুর মধ্যেই আপনি নীচে এসে গেছেন। আমি ছাদে গিয়ে দেখলাম সারাটা ছাদ হা হা করছে জ্যোৎস্নায়, চাঁদ হেলে গেছে তবু কী আলো! হাওয়ায় চারপাশের গাছগুলো মাথা ঝাঁকাচ্ছে। ভোরবেলার গন্ধ ভেসে আসতে শুরু করেছে হাওয়ায়। আপনি নেই। অথচ একটু আগেই ছিলেন। আমি নিজে চোখে দেখেছি ছিলেন। সারারাত উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি, আপনি ছিলেন। অথচ আমি যেই এলাম, আপনি নেই।

সোমনাথ বলে, তক্ষুনি নেমে এসে আমি শুয়েছি। ভোরের গন্ধটা যখন আসতে শুরু করল ঠিক তখনই।

রুমা বলে, আপনি যেখানে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আলসেতে হাত রেখে, আমি গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে সেখানে হাত রেখে। আপনি যে দক্ষিণের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি সেই দক্ষিণের দিকে মুখ করে অমনিভাবে দাঁড়ালাম।

সোমনাথের মনে পড়ল, বাবা বলেছিল, আমার যেখানে যেখানে সুর লাগেনি, তুই সেখানে সেখানে সুর লাগাস সমু। সোমনাথ বলে, কিন্তু কেন? কেন তুমি ছাদে গেছিলে রুমা?

রুমা, মোমবাতিটার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, যদি আপনি একটা গান করেন। যদি একটা গান শোনান আমাকে। আমাকে গান শেখাতে রাজি হন যদি। অতটা সময় তো আর কখনও পাবো না। সারা রাতের মতো অমন

¯c‡ivMx

সময়। এতবার হয়তো বলতেও হত না তখন। একবার বললেই হয়তো রাজি হয়ে যেতেন আপনি। আমার কীরকম মনে হয়েছিল। ওই জ্যোৎস্না, হাওয়া, ভোরবেলার গন্ধের মধ্যে আপনি রাজি হতেনই। না হয়ে আপনার উপায় থাকত না!

—কী বলছ, রুমা, তুমি! তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—বলছি, সারা রাতের মতো সময় তো আর হয় না। আপনি 'প্রায়' সারা রাত ছিলেন তাই আমি আপনাকে ছাদে গিয়ে পাইনি। আর আমি আপনার জন্য 'পুরো' সারা রাত নীচের উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলাম, আপনি নীচে তাকাননি।

—মানে?

—আপনি একবার নীচে তাকালেই দেখতে পেতেন উঠোনের মধ্যে উপর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি। আমি, ছাদে উঠে আপনাকে না পেয়ে দোতলায় এলাম, আপনার এই ঘরের সামনে। জানলার সামনে দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম নিঃশ্বাসের শব্দ। ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাস যেমন হয়। তেমন শব্দ। নেমে এলাম নীচে। তাও শুতে গেলাম না। দাঁড়িয়ে রইলাম উঠোনে, যদি ভোরে ঘুম থেকে উঠে আপনি গান করেন, যদি ছাদে আসেন! আপনি এলেন না।

রুমা চুপ করল। তারপর বলল, আমার এই মোমবাতিটা রইল। যদি গান করেন, আমার বদলে ও শুনবে। যাই।

সোমনাথ দেখল ঘরে রুমা নেই।

এতক্ষণ সে কী দেখল। কী শুনল। এ কি সত্যি না মিথ্যে। ওইটুকু মেয়ে কী সব কথা বলে গেল? এর মানে কী!

যাজ্ঞবল্ক্য বলত, আমি যা বলছি তা সত্যি না মিথ্যে সে কথা জানবার কোনও উপায় এই মুহূর্তে নেই। যেমন ওই ওস্তাদের গল্প। কিন্তু সত্যি বলে বিশ্বাস করলে, বেঁচে থাকবার আরও একটু শক্তি পাবে তুমি। আরও একটু ভাল লাগবে পৃথিবীকে!

বাবা বলত, আমার যেখানে যেখানে সুর লাগল না, তুই সেখানে সেখানে লাগাস। পারেনি সোমনাথ। অনেক জায়গাতেই সুর লাগাতে পারেনি। সোমনাথ আজ বুঝতে পারে, জীবনে অনেক পর্দা থেকে যায় যেখানে কোনও দিন সুর লাগে না। কী হবে তাদের নিয়ে?

কয়েক বছর আগে সোমনাথের মনে হয়েছিল, তার ভেতর থেকে গান একেবারেই নিভে গেছে। কখনওই জাগবে না আর। মালার সঙ্গে বিয়ের পরপরই বুঝেছিল, এই নিভে যাওয়াটা একেবারে পাকাপাকি। তার আর মালার বিয়ের নিদারুণ ব্যর্থতাটা একটু একটু বুঝতে পারছিলেন হরিসাধন। তাদের আলাদা শোয়ার ব্যাপারটা জানতে পারার পর, তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান এ সম্পর্কে। হরিসাধনেরই বা কী করার ছিল! একদিন শুধু সোমনাথকে তিনি

¯c‡ivMx

একান্তে বলেছিলেন, আমি জানি, আমি বোধহয় ভুলই করেছি।

সোমনাথ বলেছিল, না না এ কথা বলছেন কেন!

হরিসাধন বলেছিলেন, শোনো, আমার মেয়ে ছোট থেকে এত প্রশ্রয় পেয়েছে যে, নিজের ইচ্ছের বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। আর ওই লোকটা ওকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তুমি আমাকে কথা দাও বাবা তুমি আমার মেয়েটাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না কখনও।

—কোথায় যাব আর! আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।

—এ কথা বোলো না। আমি বলছি, অন্য কোনও মেয়ের কাছেও কখনও যেয়ো না তুমি। জানি, এ অনুরোধ হয়তো অন্যায়, তবু বলছি। ওকে দেখার কেউ নেই।

—অন্য কোনও মেয়ে? আপনি হঠাৎ এ কথা বলছেন কেন?

হরিসাধনকে বিপর্যস্ত দেখায়। কিছু মনে কোরো না বাবা, যদিও আমার মেয়ে মনে করে অন্য কথা, মনে করে কোনও মেয়ের কাছে যাবার ক্ষমতা তোমার নেই...।

সোমনাথ মুখ তোলে। সোজা তাকায় হরিসাধনের চোখের দিকে। তার দৃষ্টি তীব্র! হরিসাধন বলেন, আমি জানি, আমি জানি, আমার মেয়ে কেমন। তোমার মতো এমন একটি ছেলের পক্ষে, ওই মেয়ের সঙ্গে... নিজের মেয়ে... তবু বলছি, ওই মেয়ের পক্ষে হয়তো ওই অমিয় নাগই উপযুক্ত ছিল...হরিসাধন ভেঙে পড়েন। টেবিলের উপর কনুই রেখে হাতে মুখ ঢাকেন।

সোমনাথ উঠে দাঁড়ায়, হরিসাধনের বাহু ছোঁয়, বলে, আপনি দুর্ভাবনা করবেন না, আমি মাস্টারমশাইকে কথা দিয়েছি...

হরিসাধন তার হাত আঁকড়ে বলেন, তুমি আমাকেও কথা দাও বাবা, ওকে ছেড়ে যাবে না আর অন্য কারও কাছে যাবে না—তা হলে ও পাগল হয়ে যাবে। দু' দু'জন স্বামী, দু'জনেই যদি... অপর নারীর কাছে যায়... লোকে কী বলবে এই ভেবেই নিজেকে শেষ করে দেবে মেয়েটা...উঃ!

সোমনাথ কথা দিয়েছিল।

হরিসাধনবাবু মারাও গেছেন বছর কয়েক হল। কিন্তু তিনি শান্তিতেই মরতে পেরেছিলেন। হরিসাধনের মৃত্যুর পরেও মালাকে, বাবা আমার জীবনটা নষ্ট করল, এমন অভিযোগ করতে শুনেছে সোমনাথ। সোমনাথ এ-ও জানে যে, মালা তাকে পুরুষত্বহীন মনে করে। যদিও সে তা নয়। মনে করে কারণ মালার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এলেই তীব্র কেরোসিনের গন্ধ ও ধস্তাধস্তির স্মৃতি তাকে পেড়ে ফেলে।

মালার ওই অভিযোগের জন্য এমন কি তার আর তেমন কষ্টও হয় না।

সোমনাথ এটা সহ্য করে ফেলেছে। কোনও নারীর সঙ্গে শরীরের অভিজ্ঞতা হল না তার। এমনকি সে প্রেম জানল না জীবনে। কিন্তু কী বা করা যাবে।

¯c‡ivMx

কারও কারও জীবনে হয়তো এমন সব পর্দা থেকে যায়, যেখানে কোনও দিনই সুর লাগল না। সেই সব পর্দাগুলো সুর লাগবে, সুর লাগবে এই অপেক্ষায় থেকে থেকে বছরের পর বছর ধরে হয়তো ঘুমিয়ে পড়ল।

সুর যখন পৌঁছল তারা হয়তো ঠিকমতো সাড়া দিতে পারল না আর।

সুর, পর্দা এইসব ভাবতে ভাবতে সোমনাথের মনে পড়ল, আজই বিকেলের পর, কলেজের সেই অনুষ্ঠানটা আছে। যেখানে তাকে গান গাইতে হবে।

গান। গান তো তাকে ছেড়ে গেছিল ? তবে নিভে যাওয়া গান তাকে আবার ফিরিয়ে দিলেন শৈল ঘোষাল।

সোমনাথের বিয়ের কয়েকমাস পরের কথা। দুপুরে কলেজে কাজ করছিল সোমনাথ। বেয়ারা এসে বলল ট্রাঙ্ককল আছে। সোমনাথ প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে ফোন রিসিভ করল। সৌমেন চক্রবর্তী ফোন করেছেন। শৈল ঘোষাল রাতে বাথরুমে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞাহীন। সারা রাত বাথরুমে পড়ে ছিলেন। ভোরবেলা দরজা ভেঙে বার করে জেলা হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে।

সোমনাথ তৎক্ষণাৎ কলেজ থেকে ছুটি করে বেরোল। জেলা হাসপাতালে পৌঁছে আর দেখতে পেল না। বডি বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্কুলে বডি আনা হবে কি না তাই নিয়ে এখন বিতর্ক চলছে। বিষ্ণুনগর থেকে অত দূরে নেওয়া মুশকিল বলে রায় দিল সবাই। শৈল ঘোষালকে আর শেষ দেখা দেখতে পেল না তাঁর সারাজীবনের ইস্কুল।

আর সোমনাথও একবারের জন্যও এগিয়ে গিয়ে তাকাল না তাঁর শায়িত মুখে। ওই চিরনিদ্রিত মুখ সে দেখবে না। সোমনাথ জানে, সে চোখ বুজলেই দেখতে পায় মাস্টারমশাইয়ের মুখ। মাস্টারমশাইয়ের এত দিন ধরে দেখা নানা রকম মুখ। নানা বয়সের মুখ। কিন্তু একবার যদি সে এই মুখ দেখে ভবিষ্যতে সব মুখ ছাপিয়ে ওই শেষদেখার মুখই কেবল হানা দেবে তাকে। সোমনাথের মনে অছে বাবার বেলায় হয়েছিল এমন। মায়ের বেলায়। বাবার অত রকম মুখ, মুড, সব ছাপিয়ে এখনও চোখ বুজলেই তার প্রথমেই মনে পড়ে ফুল ঢাকা, শুয়ে থাকা শরীরের ঘুমন্ত মুখ। যা ঠিক ঘুমন্ত নয়। সেই অভিজ্ঞতা এবার আর সে ফেরত পেতে রাজি নয়। শৈল ঘোষাল তার কাছে চিরকাল জীবিতই থাকবেন। তাঁর ফুল ঢাকা শরীরের ওপর জেগে থাকা মুখ সে দেখবে না, দেখবে না, দেখবে না।

সোমনাথ ফুল দেখল। ফুলের ঢল শেষে দুটি পায়ের পাতাকে দেখল, আকাশের দিকে উঁচু হয়ে আছে। এই পায়ের পাতা দু'টিকে ছুঁয়ে কতবার সে প্রণাম করেছে, তখন পাতা দুটি মাটি ছুঁয়ে নিচু হয়ে থাকত। এখন তারা উঁচু হয়ে আছে। এই অবস্থায়, প্রথম ও শেষবার সে স্পর্শ করল ওই পা দু'টিকে। কিন্তু মুখের দিকে তাকাল না একবারও। চিতায় ওঠানোর আগে, মাটিতে নামিয়ে রাখা খাটের পায়ের দিকে বসে পড়ল সে। সামনে নদী আর তার হু-হু হাওয়া। সামনে চিতা। সামনে ডোম। সামনে সাজানো কাঠ। পায়ের

¯c‡ivMx

দিকে বসে দুটি পা বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল সে। পায়ের পাতায় তার বন্ধ চোখ দু'টি ছোঁয়াল। মাথা রাখল। বলল, আমার জীবন ধন্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মাস্টারমশাই। ভাববেন না যে, আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি ইচ্ছে করলেই, চোখ বুজলেই, মনে মনে দেখতে পাব আপনাকে, মনে মনে শুনব আপনার গান। যত গান শুনিয়েছিলেন সব সব মনে আছে আমার। আমার জীবনের অনেক জায়গা আছে মাস্টারমশাই, সুর লাগেনি। যেখানটায় লেগেছিল, আপনার হাত ধরে লেগেছিল। হ্যাঁ, মাস্টারমশাই আপনার সুর আমাতে লেগেছিল। আমি বেজে বেজে উঠেছিলাম। আমাকে আপনি ভুলতে পারবেন না মাস্টারমশাই। মৃত্যুর পরে, যেখানে, যে জগতে খুশি যান। বাড়ি বিক্রি করে, যেখানে খুশি চলে যান আপনি, যে কোনও আগুনে, জলে, হাওয়ার অতীত কোনও দেশে। এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, আপনি আমাকে ভুলতে পারবেন না মাস্টারমশাই। আমি আপনার ছেলে নই, মানুষ ছেলেকেও ভুলে যায়, কিন্তু আপনি আমার মাস্টারমশাই, আপনি আমাকে ভুলতে পারবেন না। আমি আপনার মরা মুখ দেখলাম না, তাই, আপনি আমার কাছে জীবিত থাকতে বাধ্য হবেন। মাস্টারমশাই, আপনি বাধ্য হবেন।

সোমনাথ মাথা তুলছে না পা থেকে অনেকক্ষণ। সৌমেন চক্রবর্তী এসে কাঁধে হাত রাখলেন। সোমনাথ, সোমনাথ ওঠো।

সোমনাথ মুখ তুলল। সৌমেন চক্রবর্তী দেখলেন তার চোখে একফোঁটাও জল নেই। খরখরে শুকনো আর লাল। সোমনাথ বিড়বিড় করে কী বলছে। শরীর উঠে গেল চিতায়। আগুন জ্বলে উঠল। সৌমেন চক্রবর্তী বললেন, সোমনাথ, এদিকে তাকাও। সোমনাথ তাকাল না। শুনতে পেল না। তার চোখ চিতার দিকে। সৌমেন চক্রবর্তী বললেন, সোমনাথ কাঁদো। সোমনাথ কাঁদবে না? মাস্টারমশাই যাচ্ছেন। কাঁদতে হয়। মাস্টারমশাইয়ের জন্য, কাঁদতে হয়।

সোমনাথের মনে পড়ল বাবা বলেছিল, প্রথম দিন, যখন শৈল ঘোষাল বিস্কুট এগিয়ে দিয়েছিলেন, বাবা বলেছিল নাও মাস্টারমশাই দিচ্ছেন নিতে হয়।

সোমনাথ তার বাবার মৃত্যুতে, মায়ের মৃত্যুতে কাঁদেনি। কিন্তু এবার তার কাঁধের উপর রাখা সৌমেন চক্রবর্তীর হাতের উপর মুখ রেখে হু-হু করে কেঁদে ফেলল। কত বছরের কান্না দাউ দাউ করে বেরিয়ে আসতে লাগল। সৌমেন চক্রবর্তীর হাতের পাতা দুটো পুড়ে ঝলসে গেল তাতে।

কিছুক্ষণ পর সোমনাথ একটু শান্ত হতে, সৌমেন চক্রবর্তী বললেন, সোমনাথ, দ্যাখো, কে এসেছে। সোমনাথ দেখল, যাজ্ঞবল্ক্য।

সৌমেন চক্রবর্তী বললেন, যাজ্ঞ, আজ আমার হাত দুটোর বড় পুণ্য হল। এইরকম চোখের জল স্পর্শ করতে পারল!

¯c‡ivMx

ঘাসের উপর বসে রয়েছে তারা। মেয়েদের শ্মশানে যেতে নেই। এই বিশেষ নিষেধ উপেক্ষা করে শৈল ঘোষালের দুই ভাগনি এসে বসে রয়েছে রাত্রির শ্মশানে। ভাইপোরা প্রবাসী, তারা আসেনি। এসেছেন, স্কুলের দু'জন শিক্ষক। ভাগনে মুখাগ্নি করেছে।

দূরে চিতা জ্বলছে।

সৌমেন চক্রবর্তী বললেন, সোমনাথ, গান শোনাবে না মাস্টারমশাইকে ?

সোমনাথ তাকাল, তার চোখে আটকে আছে জলের ফোঁটা।

—মাস্টারমশাই চলে যাচ্ছেন, গান না শুনে যাবেন তোমার ? শোনাও, শোনাতে হয়।

সোমনাথের মনে পড়ল, প্রথম যেদিন শৈল ঘোষাল তাদের বাড়ি এসেছিলেন আর গান করতে বলেছিলেন তাকে, তখন বাবা বলেছিল, করো, করতে হয়।

সোমনাথ শুরু করল : আমি তোমায় যত, শুনিয়েছিলেম গান/ তার বদলে আমি চাইনি কোনো দান।

সবাই একটু অবাক। রবীন্দ্রনাথের গান। এ গান তো কখনও গায় না সোমনাথ। কিন্তু এখন অনেকখানি কান্নার পর তার গলা বড় গভীর হয়ে গেছে। সুর যেন আগুন বাতাস জলের মতো অপ্রতিহতভাবে পৌঁছচ্ছে তার গলায়। সে গেয়ে চলেছে। গেয়ে চলল, একের পর এক গান। সাত আট দশখানা। সবাই তার সামনে ঘিরে বসেছে। অন্য শবদেহের সঙ্গে আসা পাশের চিতার আত্মীয়স্বজন অচেনা শোকতপ্ত মানুষরা এসে দাঁড়িয়েছে ঘিরে। সকলের চোখে জল পড়ছে। অচেনা অচেনা সব মানুষ, নিজের নিজের কান্না উদযাপন করছে তারা। শোক উদযাপন করছে। আনন্দস্মৃতি, বিচ্ছেদস্মৃতি, এত দিনের একসঙ্গে কাটানোর স্মৃতি উদযাপন করছে তারা, সমবেত নিঃশব্দ কান্নায় ! আর সোমনাথের গানে।

এইভাবে গান তাকে ফিরিয়ে দিলেন মাস্টারমশাই।

সেই থেকে গান সোমনাথের সঙ্গ নিল আবার। বাড়িতে গাইতে গেলে মালার মুখ কঠিন হয়ে যেত। আপত্তি করত। পুরুষ মানুষের বাড়ি বসে বসে গান গাওয়া সে দেখতে পারে না। রেকর্ড ক্যাসেট শুনলেও সোমনাথ শোনে আস্তে, গোপনে। ক্যাসেট ইত্যাদি কেনা বিষয়ে মালার মত হল, পয়সা নষ্ট করা হচ্ছে। প্রকাশ্যে গাইতে না পারলেও মনে মনে গান সব সময়ই বয়ে চলে সোমনাথের। মালা বাড়ি না থাকলে সে গলা ছাড়ে। আর মালাকে প্রায়ই বেরোতে হয়, বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে। সুতরাং প্রায়ই সে গাইবার সুযোগ পায়। এ ছাড়া আর সে গাইতে পারে জোর করে কেউ বসিয়ে দিলে। সাধারণত কলেজেই হয় এমন। আজই তো এমন একবার বসতে হবে গাইতে।

কলেজ মনে পড়তে সোমনাথ ঘড়ির দিকে তাকাল টেবিলে। হ্যাঁ এবার

¯c‡ivMx

চান করতে যেতে হবে। রান্না কিছু করবে না আর। রাস্তায় খেয়ে নেবে। হোটেলে। রান্নার লোক একজন আছে তাদের, সকালে আসে, সন্ধেয় যায়। কাছেই বাড়ি। কিন্তু, মালা কোথাও দু-চার দিনের জন্য গেলে তাকে ছুটি দিয়ে দেয় সোমনাথ। ঠিকে কাজের একজন আছে। সে বাসনটাসন মাজে। এই সময় তো এসে পড়ে অন্য দিন। থাক, নীচের দরজাটা তো খোলাই আছে রাত থেকে। সোমনাথ স্নান করতে ঢুকে পড়ুক না। আরতি এসে নিজের মতো কাজ করতে শুরু করবে।

স্নান করতে ঢুকে মাথার উপরকার শাওয়ার খুলে দাঁড়াল সোমনাথ।

মাথায় জল পড়তে লাগল।

সোমনাথ ভাবে, জল কোথায় যায়! গানের সময় তার বাবার চোখ থেকে, মাস্টারমশাইয়ের চোখ থেকে যে জল পড়েছিল, চিতার সামনে তার চোখ থেকে পড়েছিল যত জল, তারা সব কোথায় গেছে? কোথায় যায়?...লুকিয়ে বয়ে যাওয়া সেই গানের নদীতেই যায় নিশ্চয়ই।

জল বলে চল...

৯

কলেজে পরীক্ষা হয়ে যাবার পর, খাতাপত্রের ব্যবস্থা করে, হাতের কাজ মিটিয়ে, সোমনাথ যখন খেয়ে আসবে ভাবছে, তখনই সুবীরবাবু এলেন। এঁদের একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। বললেন, সোমনাথ, শুনছি বারোটার পর থেকে নাকি ট্রেন বন্ধ। তার ছিঁড়ে গেছে কোথাও একটা। শ্যামশ্রী বোধহয় আটকে পড়েছে পথে।

—কী করে জানলেন।

—আমাকে বলে গিয়েছিল, বেলা একটার মধ্যে পৌঁছবে। ওর তো ইনভিজিলেন্স ছিল না আজ। বিকেলের প্রোগ্রামটার জন্যই আসছে। ওর দুজন বন্ধুও আসছে কলকাতায়। আবৃত্তি করবে।

—না, বলছি ট্রেন বন্ধ জানলেন কী করে!

—পরিমল বলল, ও স্টেশনে গিয়েছিল। অ্যানাউন্সমেন্ট শুনেছে সব ট্রেন বন্ধ। ১১টা থেকেই শিয়ালদা থেকে কোনও ট্রেন রওনা হচ্ছে না। কলকাতা থেকে আজ শ্যামশ্রীরই শুধু আসার কথা। কী যে হবে।

সোমনাথ বলল, দেখুন, এসে পড়বেন নিশ্চয়ই।

—এলেই ভাল। তুমি কিন্তু থেকে সোমনাথ। ৫টার বেশি তো দেরি করা যাবে না।

সোমনাথের ক্লান্ত লাগছে। হোটেল থেকে খেয়ে এসে সোমনাথ, অফিসঘরের পাশের একটা ক্লাস ঘরে গিয়ে বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ল। এই ঘরটা বন্ধ করতে করতে বিকেল হবে। ঘুমিয়ে পড়ল সোমনাথ।

¯c‡ivMx

হ্যালো মাইক টেস্টিং হ্যালো, আওয়াজে ঘুম ভাঙল তার। হলঘরে মাইক বসানো হয়েছে। এ সবের যে কী দরকার! এই মাইক, আলো, লোকজন দেখলেই বোবা হয়ে যায় সোমনাথ। গুঞ্জনকে দেখতে পায় না। তাই গানও হয় না তার। যা হয় তা আড়ষ্ট। চেষ্টাকৃত।

সোমনাথ গুটিগুটি হলঘরে প্রবেশ করল। সামনে দুটো বড় টেবিল জুড়ে তার ওপর ফরাস পেতে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। একপাশে হারমোনিয়াম তবলা রাখা। দুটো মাইক্রোফোন। সুবীরবাবু তাকে দেখে এসে বললেন, সোমনাথ, চা খাবে তো। এই, এদিকে দাও। কেটলি হাতে একজন এসে সোমনাথকে ভাঁড়ে চা দেয়। সুবীরবাবু বলেন, দ্যাখো, আমাদের এবার শুরু করে দেওয়াই উচিত। শ্যামশ্রী বোধহয় আর আসতে পারল না। কিন্তু আমরা তো বেশি দেরি করতে পারব না। তুমি, তোমাকে দিয়ে শুরু করে দিই?

—যা বলবেন, স্যার।

—দাঁড়াও, আমি তা হলে অ্যানাউন্স করে দিই। আর তুমি কিন্তু চার-পাঁচটা গান অন্তত করবে সোমনাথ, কেমন।

সোমনাথ বিচলিত হয়, অতগুলো স্যার! মানে, উদ্বোধন হিসেবে একখানা গান, গাইতে...মানে...পারব আর কি।

—না সোমনাথ। ওই ধন্যধান্যে পুষ্পে ভরা আর নয়। আর এটা তো ঠিক সে ধরনের কিছু নয়। নিশ্চয়ই আরও গান জানা আছে তোমার। মানে ব্যাপারটা চালাতে হলে, বুঝতে পারছ, গান গাইবার কথা তো ছিল, তোমার, মন্দিরা সেনের, আর বাংলার আরতি সেনগুপ্তর। মন্দিরা আসতে পারছে না। আর আরতিদির একটু দেরি হবে বলেই দিয়েছেন। শ্যামশ্রীদের আবৃত্তি না নাটক, সেটা তো হবেই না। তুমি যদি চার-পাঁচখানা না গাও। লোকে থাকবে কেন!

লোক! সোমনাথ দেখল হলঘরের এক চতুর্থাংশে কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। বড় জোর জনা কুড়ি হবে। কলেজের কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকা, কয়েকজন ছেলে মেয়ে। মাইক টেস্টিং শুনে ঢুকে পড়া কৌতূহলী কয়েকটা বাচ্চাও।

সুবীরবাবু ঘোষণা করছেন, আমরা, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা, অন্য সব বিভাগকে সঙ্গে নিয়ে, আজ একসঙ্গে হয়েছি। ঠিক কোনও উপলক্ষে নয়। এমনিই। অকারণে আমরা ঠিক করেছি, মাঝে মাঝেই এইরকম সবাই মিলে একসঙ্গে হব। একটু গান গাইব কেউ, কেউ বা আবৃত্তি শোনাব কেউ বা কিছুই করব না, শুনব শুধু। পরে আবার কবে বসা যায়, কী করতে পারা যায়, ঠিক করব শুধু। কিন্তু যাই করি, সবাইকে ডেকে একসঙ্গে। কেবলই কলেজে আসা, ক্লাস করা, চলে যাওয়া, না এই যে আমরা একসঙ্গে হয়েছি। নিজেদের মধ্যে একটু দেওয়া নেওয়া করব বলে। কোনও উপলক্ষ ছাড়াই।

¯c‡ivMx

এই, নিতান্ত অকারণে, একসঙ্গে হওয়া, গান বাজনা কবিতা শোনার এই পরিকল্পনা যার মাথা থেকে এসেছে, এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগ যে নিয়েছে, সে হল আমাদের বিভাগের শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি। পার্টটাইম পড়াচ্ছে সে এখানে। দুঃখের বিষয় আজই সে এসে পৌঁছতে পারেনি। ট্রেন বিভ্রাটের কারণে। আমরা আশা করছি সে এসে যাবে। ইতিমধ্যে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করে দিচ্ছি। সোমনাথ বসুর গান দিয়ে। সোমনাথ বসু আমাদের কলেজের একজন কর্মী। তিনি আপনাদের কয়েকটি গান গেয়ে শোনাচ্ছেন সোমনাথ...সোমনাথ...এসো...

সোমনাথ এগিয়ে এসে, সিঁড়ির কাজ করাবার জন্য যে-চেয়ারটা রাখা হয়েছিল, তার ওপর পা দিয়ে স্টেজে উঠে গেল। কোলের কাছে হাত দুটো জড়ো করে বসল পদ্মাসনে। বাড়িতে গান গাইবার সময় এইভাবে বসতেন মাস্টারমশাই। একটি ছেলে তার সামনে মাইক্রোফোনটা এগিয়ে পিছিয়ে বসিয়ে দিয়ে গেল। স্টেজটা হাঁটাচলার সময় অল্প অল্প নড়ছে।

সোমনাথ কোথাও গুঞ্জনকে দেখতে পেল না। বাইরের দরজার সামনে দিয়ে কিছু লোক ঘোরাঘুরি করছে। কেউ উঁকি মেরে চলে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে সুবীরবাবু-সহ সবাই নড়াচড়া করছে, এ ওকে ডাকছে। যারা বসে আছে তাদের কেউ কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। কেউ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে দেখছে।

চোখ বন্ধ করল সোমনাথ।

এসো গুঞ্জন। এসো গুঞ্জন। এসো।

গুঞ্জন, তুমি কোথায়।

গলা ঝাড়ার অভ্যাস নেই সোমনাথের।

সে চুপ করে বসে আছে। কী গান গাইবে ? মনে কিছু আসছে না। একটা লাইন গানও যেন জানা নেই তার। কী করবে সে। সে যে গুঞ্জনকে দেখতে পাচ্ছে না !

সুবীরবাবু এগিয়ে এসে চাপা গলায় ডাকলেন, কী হল সোমনাথ, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি তোমার ?

সোমনাথ চোখ খুলল, সুবীরবাবু দেখলেন তার দৃষ্টি ফাঁকা।

—কী হয়েছে সোমনাথ।

সোমনাথ চোখ বন্ধ করল। গুঞ্জন, তুমি আসবে না ! এসো গুঞ্জন। এসো।

সোমনাথ গান শুরু করল :

এসো প্রাণ সখা এসো প্রাণে,
মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে
প্রাণ সখা এসো প্রাণে

সারা ঘর ঝন ঝন করে উঠল সুরে। অন্যমনস্ক কথাবার্তা এক পলকে থেমে

¯c‡ivMx

গেল। সুর ভরা গলায় সোমনাথ গাইতে লাগল :

কর তৃষিত প্রাণ অভিষিক্ত
তব প্রেম সুধারস দানে

বসে আছি পাতি মম অঞ্চল
অতি শঙ্কিত কম্পিত চঞ্চল
এসো হে, প্রিয় হে, প্রিয় বাঞ্ছিত...

চোখ বন্ধ করে একমনে গাইতে গাইতে গুঞ্জনকে ভাবতে লাগল সোমনাথ।

গান শেষ করে চোখ খুলল।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে আছে হলঘরের দেওয়ালে হেলান দিয়ে। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। সুবীরবাবু এগিয়ে এসে তাকে কী বলছেন।

সোমনাথ দেখল, গুঞ্জন হলঘরের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছে। সোমনাথের দিকে এগিয়ে আসছে গুঞ্জন। সোমনাথ শুরু করল, এ কী মধুর ছন্দ, মধুর গন্ধ, পবন মন্দ মন্থর, এ কী মধুর মুঞ্জরিত নিকুঞ্জ পত্র পুঞ্জ মর্মর...

আনন্দে ভেতরটা ভরে যাচ্ছে তার। এক এক দিন মাস্টারমশাই তাকে বলতেন, ওই গানটা করো তো, সমু, এ কী মধুর ছন্দ। তখন সে যে—আনন্দে গাইত, আজ আবার যেন সেটা ফিরে এসেছে, সে গাইছে—উঠে বেণুগান মধুর তান, কিন্তু বুঝতে পারছে না, বাঁশিরই মতন তার গলা সারা ঘরে সুর ভরে দিচ্ছে। গান শেষ করে, সোমনাথ চোখ খুলে দেখল আরতি সেনগুপ্ত এসে বসেছেন সামনে, তা হলে তার এবার উঠে পড়া উচিত।

উঠতেই বাধা পেল সোমনাথ।

আর একটা, সোমনাথ উঠো না।

সুবীরবাবু ছুটে এলেন সামনে।

সোমনাথ বসে পড়ল আবার। দেখল একসারি পিছনে বসে শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। চশমার পিছনে সেই চোখ। থুতনির পাশে সেই আঁচিল। তার দু'পাশে দু'টি যুবক। সোমনাথ চোখ বন্ধ করল। আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই, আলোর মতন হাসির মতন, কুসুমগন্ধ রাশির মতন হাওয়ার মতন নেশার মতন ঢেউয়ের মতন ভেসে যাই। সোমনাথ এই গান যখন শুনত, রেকর্ডে, তৃষ্ণা চৌধুরী তাকে বলতেন, করো সোমনাথ, আমার সঙ্গে করো, দাও, গলা দাও, ভয় কী...সোমনাথ গলা দিত। যদিও সোমনাথ তৃষ্ণা চৌধুরীকে কখনও সামনে থেকে দেখেনি, তাঁর কাছে গান শেখবার কথা ভাববার সাহস তার হয়নি কখনও। কিন্তু একলা ঘরে, রেকর্ড বাজিয়ে দিয়ে, এই গানটার সময় তৃষ্ণা চৌধুরী তাকে বলতেন, করো সোমনাথ, আমার সঙ্গে করো, ভয় কী। হাতে তালি দিয়ে দিয়ে গাইত সোমনাথ। সোমনাথ জানত তৃষ্ণা চৌধুরী তাকে আশীর্বাদ করছেন। উনি যে

¯c‡ivMx

সরস্বতী।

আজও এই গান গাইতে গাইতে সরস্বতীকে নিজের সামনে অনুভব করল সোমনাথ। তৃষ্ণা চৌধুরী যেন তাকে ববলছেন,

আমরা, যারা গান গাই তারা তো এই রকমই
আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই তারা তো এই রকমই
আমাদের আয়ুর ওপর দিয়ে, একা নির্জন
আহত মানুষের মনের ওপর দিয়ে,
আলোর মতন হাসির মতন
কুসুমগন্ধ রাশির মতন...স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই।

স্বপ্ন থেকে এসে স্বপ্নের দিকে চলে যাওয়া। হাওয়ায় হাওয়ায় আমাদের সুর পড়ে থাকে সোমনাথ...

কেউ কেউ ধরে নেয় সেই সুর, যেমন তুমি ধরে নেবে সোমনাথ? ধরে নাও! গাও, আমার সঙ্গে সঙ্গে করো...

তৃষ্ণা চৌধুরী, একা ঘরে গাইবার মতোই, আজ এই প্রকাশ্যেও সাহস দিলেন তাকে, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে গেয়ে চলল সোমনাথ, হাতে তালি দিয়ে দিয়ে গেয়ে চলল। এই একমাত্র সঙ্গত সোমনাথের। তৃষ্ণা চৌধুরীর গান এই প্রথম, সে, প্রকাশ্যে গাইতে পারল। তিনি যদি অলক্ষে এসে না দাঁড়াতেন, না দিতেন গলা সোমনাথ কি পারত? না পারত না।

সোমনাথ, হাত দুটো জড়ো করে প্রণাম করল।

কুড়িজন দর্শকের কেউ বুঝতে পারল না, সোমনাথ প্রণাম করছে তৃষ্ণা চৌধুরীকে।

প্রণাম করেছে মাস্টারমশাইকে।

প্রণাম করছে তার বাবা মাকে।

সোমনাথ নামতে সুবীরবাবু উঠলেন স্টেজে। উঠতে উঠতে বললেন, খুব ভাল হয়েছে। যেয়ো না। আসছি।

সোমনাথ রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। তার ভেতরে গান জেগে উঠেছে। আজ সারা রাত বাড়ি গিয়ে গান গাইবে সে। এখানে আর ভাল লাগছে না। আরতি সেনগুপ্তর বাংলা আধুনিক গান শুনতে গেলে, তার ভেতরের এই আবহাওয়া হারিয়ে যাবে। সুবীরবাবু ঘোষণা করছেন, এখন আমাদের কলেজের অধ্যাপিকা আরতি সেনগুপ্তর গান শুনব আমরা। তার সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করছে, আমাদের ছাত্র তমাল। তমাল রায়। তমাল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আমাদের ইংরাজিরই। আরও একটা কথা, প্রথমে যার কথা বলছিলাম, আমাদের নতুন সহকর্মী, শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি, তিনি এসে পৌঁছেছেন। ট্রেন বন্ধ থাকায়, বাস, অটোরিকশা ইত্যাদিতে বহু কষ্ট করে এসেছেন ওঁরা। ওঁরা মানে, শ্যামশ্রীর সঙ্গে আছেন ইন্দ্রনীল রায়, আর সুদীপ বসু। তাঁরা সবাই, রবীন্দ্রনাথের নাটক থেকে পাঠ করে শোনাবেন। এখন, আরতি সেনগুপ্তর

¯c‡ivMx

গান তা হলে আমরা শুনি, কেমন।

ভালই বলেন সুবীরবাবু, পোশাকি নয়। বেশ ঘরোয়াভাবে।

সোমনাথ হলঘরের একটু পিছনের দিকে গিয়ে পার্শ্ববর্তী একটা দরজার ধারে দাঁড়াল। দেয়ালে ঠেস দিয়ে। খানিকক্ষণ এভাবে থাকবে সে। যেন খুব মন দিয়ে, আয়েস করে শুনছে। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় কেউ তেমন খেয়াল করবে না। ছাত্র অনুষ্ঠানগুলোয় উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবার পর তাকে যাতে সমস্ত অনুষ্ঠানটায় থেকে যেতে না হয়, তাই এ কৌশলটা সে রপ্ত করেছে। নইলে, তারা প্যাকেট পেয়েছেন সোমনাথদা ? কিংবা শ্রুতিনাটকটা দেখে যান, এর পরেই হবে, এমন করে তাকে বেশ যন্ত্রণা দেয়। আজও সে পালাবে একটু পরেই। সুবীরবাবু তার দিকে এখন কিছুক্ষণ খেয়াল করবেন না। এই সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে। কেউ একজন তাকে পাশ দিয়ে যাবার সময় বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন না। সে বলল, না ঠিক আছে। আর দেখল, শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি উঠে এদিকটায় আসছে। একেবারে মুখোমুখি হয়ে পড়তে হবে তা হলে। সোমনাথ, সেটা চায় না। কেন চায় না তা সে জানে না। কিন্তু এই মুহূর্তে সে যেন বসার জন্য বেশ আগ্রহী এইভাবে, অনেক ফাঁকা চেয়ারের একটা নিয়ে বসল। আর শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি তার পাশ দিয়ে চলে না গিয়ে বসল। ঠিক তার সামনের চেয়ারটায়। বসে, সরাসরি ঘুরল তার দিকে।

—কাছ কাছে শিখেছেন আপনি ?

—আজ্ঞে।

সোমনাথ দেখল সেই দুটি আয়ত চোখ। স্টিল ফ্রেমের চশমার পিছনে জ্বলজ্বল করছে। খাড়া নাক।

—বলছি কার কাছে শিখেছেন।

সোমনাথ দেখল, থুতনির পাশে একটা আঁচিল।

সোমনাথ বলল, কারও কাছে শিখিনি !

—সে কী ? শেখেননি ?

মুখে বিস্ময়ের অব্যর্থ ছাপ। মুখে সারা দিনের ক্লান্তি সন্ধেয় আবছা হয়ে আছে। তার সঙ্গে সোমনাথ দেখল, কপালে লম্বা একটা টিপ। বেঁকে আছে একটু।

—সত্যি শেখেননি ?

—না। দিদিমণি।

—আমাকে দিদিমণি বলছেন কেন। আমি আপনার সহকর্মী।

—জানি দিদিমণি।

—কী আশ্চর্য, আবার দিদিমণি। আমাকে দিদিমণি বলার কী আছে। আপনি তো আমার স্টুডেন্ট নন। আপনি জানেন কী অসাধারণ গান করেন আপনি। আমাকে কেউ বলেনি এতদিন ! ইস্ ! সুবীরদা অবশ্য বলতেন,

¯c‡ivMx

সোমনাথ গান জানে।

—আমি গান জানি না।

—জানেন না ? মানে ? বিনয় করছেন।

—সত্যিই আমি গান জানি না।

নতুন ম্যাডাম এবার বেশ বিরক্ত। তা হলে এসব গান শিখলেন কী করে ? করছেন কী করে ?

—শুনে শুনে।

—শুনে শুনে। কার কাছে শুনেছেন।

—মাস্টারমশাইয়ের কাছে। বাবার কাছে।

তৃষ্ণা চৌধুরীর নামটা বলতে পারল না সোমনাথ। সে তো আর সামনে থেকে কখনও শেখেনি। তৃষ্ণা চৌধুরীর নামটা করা কি উচিত হবে তার ? যদিও এ গান সে মাস্টামশাইয়ের কাছে শুনেছে। বাবার কাছে শুনেছে। কিন্তু তৃষ্ণা চৌধুরী যে তার সরস্বতী এ কথাও তো ঠিক ! সোমনাথ জানে না কী করা উচিত।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি কিন্তু বেশ উত্তেজিত, এই তো বলছেন মাস্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছেন। তার মানেই গানের মাস্টামশাই কেউ আছেন নিশ্চয়ই আপনার। বা ছিলেন। আপনার বাবা কি গাইয়ে ছিলেন ?

—না, বাবা মারোয়াড়িদের অফিসে হিসেবপত্র দেখত। আর মাস্টারমশাই যাকে বলছি, তিনি আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন।

—কোন ইস্কুল আপনার ?

—এই শিব চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়। নদীর ধারে যেটা।

—আপনি এখানেই পড়াশোনা করেছেন !

—হ্যাঁ।

—মাস্টারমশাই গান গাইতেন, কিন্তু বলতেন গান শেখাবার অধিকার তাঁর নেই।

—কেন, এ কথা বলতেন কেন তিনি ! তিনিও বুঝি আপনার মতো বিনয়ী ছিলেন।

—মাস্টারমশাই বলতেন, গান যাঁরা শেখান, গানকে তাঁদের নিজের জীবনটা দিয়ে দিতে হয়। সঙ্গীতকে দিয়ে দিতে হয় নিজের সর্বস্ব।

—তাই নাকি ! আর কী বলতেন তিনি ?

—মাস্টারমশাই বলতেন, আমি নিজের জীবনটা সঙ্গীতকে দিতে পারিনি। গান শেখাবার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু মাঝে মাঝে শোনাতে পারি। তাও দু-একজন আত্মীয়-বন্ধুকে। তার বাইরে নয়।

—আপনার মাস্টারমশাইয়ের নামটা কী ?

—শৈল ঘোষাল। এখন আর নেই তিনি। আমি যদি ভুল করেও কাউকে বলে ফেলতাম, মাস্টারমশাইয়ের কাছে শিখেছি, উনি রাগ করতেন। বলতেন,

¯c‡ivMx

অনধিকারীর কাছে গান শেখার কথা প্রচার করলেও নাকি গানের অসম্মান হয়।

অনেকগুলো কথা একসঙ্গে বলে, দম নেয় সোমনাথ, দেখে, তার দিকে পলকহীন তাকিয়ে আছে শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি। দেখে, কপালের একদিকে আলো পড়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বাঁকা লম্বা টিপ।

—ভারী সুন্দর কথা বলেন তো আপনি!

সোমনাথ এ কথা কোনও মেয়ের মুখে কখনও শোনেনি।

—ওগুলো মাস্টামশাইয়ের কথা।

—ভাবছি, আজ আপনার গান শুনে আপনার মাস্টারমশাই নিশ্চয়ই বলতে পারতেন না, গানের অসম্মান হল!

সোমনাথ বলে, আসলে শোনার বেশি তো আর কিছু করিনি আমি। শোনাটা তো শেখার একটা ধাপ। অন্য অনেক ধাপ তো আছে। সেগুলো তো কিছু জানা হয়নি আমার।

পিছনে একটি যুবক এসে দাঁড়াল।

—শ্যামশ্রী, চল। আমাদের ডাক পড়বে।

—হ্যাঁ, চল। এই যে সোমনাথ বসু, এঁর গান শুনলি তো। এ ইন্দ্রনীল, আমার বন্ধু।

যুবকটি হাত জোড় করে না। করমর্দনের ভঙ্গিতে হাত এগিয়ে দেয়। সোমনাথ জড়তা ভেঙে নিজের হাত প্রত্যুত্তরে এগিয়ে দিতে বেশ একটু দেরি করে ফেলে।

যুবকটি তার হাত ঝাঁকিয়ে বলে, ভাল লাগল আপনার গান!

তার গলা বেশ গম্ভীর। উচ্চারণ কাটা কাটা।

শ্যামশ্রী বলে, ভাল কী রে! এক্সেলেন্ট বল্!

যুবকটি থেমে থেমে, বেশ ভেবে ভেবে বলে, হ্যাঁ, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সেরকম বলতে পারা যায়, অবশ্য, যদিও, তাতে...দ্বিজেন্দ্রগীতির একজন বিখ্যাত গায়িকার গায়ন-রীতির ছাপ পাওয়া যাচ্ছিল, তবু, সে ক্ষেত্রে...

সুবীরবাবুর ঘোষণা শোনা গেল, আরতি সেনগুপ্ত আমাদের এতক্ষণ গান শোনালেন। আরতিদিকে ধন্যবাদ। এবার আমাদের আছে নাটক থেকে পাঠ। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটক থেকে পড়ে শোনাবেন, শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি, ইন্দ্রনীল রায় এবং...

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জিরা উঠে পড়েছে। মাইকের স্ট্যান্ড আর মাউথপিস সোজা অথবা হেলানো হচ্ছে সুবিধেমতো। দর্শক আগের চেয়ে বেড়েছে, প্রায় দ্বিগুণ। সুবীরবাবু এবার সামনের সারিতে একটা চেয়ারে বসে পড়বেন। অর্থাৎ এই নাটকপাঠের ব্যাপারটা উনি শুনবেন।

সোমনাথ, উঠে, পাশের দরজা দিয়ে বাইরে চলে এল। কেউ লক্ষ করল

¯c‡ivMx

না।

অন্ধকার মাঠ। দূরে দূরে কাপড়ের মিল। মাঠের পাশে সরু রাস্তা। পিচের। তারপরেই ন্যাশনাল হাইওয়ে। এন. এইচ থার্টিফোর। বড় বড় লরি যাবে সারা রাত। এখন সন্ধে। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানগুলোয় হ্যাজাক ঝোলানো। এই অন্ধকার মাঠ থেকে তাকালে, হ্যাজাকের সামনে মানুষের অস্পষ্ট নড়াচড়া দেখা যায়।

সোমনাথের গানও সোমনাথের কাছে আসলে অস্পষ্ট নড়াচড়া। পুরো জানা হল না সুযোগ হল না জানার। রাগরাগিণী জানল না। শুধু সুরের স্পষ্ট অস্পষ্ট নড়াচড়া তুলে নিল গলায়। বাইরে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সারা জীবন ধরে শোনার সুযোগও হল না।

কলেজ থেকে ক্রমশ দূরবর্তী হচ্ছে সে। কিন্তু আওয়াজ ভেসে আসছে পিছন থেকে। মাইকে নারীকণ্ঠ বলছে, শুনতে পাচ্ছ। শোনো। পুরুষকণ্ঠ বলছে, সময় নেই।

সোমনাথ আকাশের দিকে তাকায়। অনেক তারা। মাস্টারমশাই কি তার গান শুনেছেন আজ ? মাস্টারমশাই, শুনেছেন ! বাবা, তুমি ?

অন্ধকার মাঠ থেকে আরও অন্ধকার মাঠের দিকে হাঁটতে লাগল সে। মাঠ পেরিয়ে, ঘুর পথে, আঁকাবাঁকা গলি দিয়ে, বাড়ি ফিরবে সে। আলো, রাস্তা, রিকশা লোকজন এড়িয়ে ফিরতে হবে। নইলে বাইরের আওয়াজে তার ভিতরকার সুর ভেঙে যাবে।

কলেজ থেকে এই যে দূরবর্তী সে। এইভাবে, গান শোনা থেকেও বার বার দূরবর্তী হতে হয়েছে তাকে। বাধ্য হয়ে। তার মনে পড়ে, একবার, গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে এসেছেন সৌমেনবাবু, বিষ্ণুনগর কলেজে। দুপুরে, বক্তৃতা সভার পর, সন্ধেবেলা বসা হয়েছে, 'আলেখ্য' স্টুডিওর পিছনের হলঘরে। গোবিন্দগোপাল গাইলেন, তোমারে, কী বল বলিব শ্যামল, বলিবার কথা কী আর আছে ! স্টুডিওর মালিক সঙ্গীতোৎসাহী সন্তোষদার সঙ্গে চা বানাচ্ছে, হাতে-হাতে অভ্যাগতদের দিচ্ছে সোমনাথ। সৌমেনবাবু বললেন, আজ রাতে থেকে যাও সোমনাথ, তুমি গাইবে, রাতে, আমার বাড়িতে।

সোমনাথ ভাবল, ৮টা ৫৫-র লাস্ট লোকাল এখন ৮টা ৫১ হয়েছে। সোমনাথকে পালাতে হবে। সোমনাথ পালাল। তখন সোমনাথের গান নেভা অবস্থা চলছে, কিন্তু সেজন্য নয়। রাতে না-ফিরলে, মালা ঘুমোবে না সারা রাত। বার বার নিজের ঘর থেকে খবর নেবে। ভোরে এসে সে এক বাঘিনীর সামনে পড়বে। যদিও মালা মনে করে সোমনাথের পুরুষত্ব নেই, তবু, রাতে না ফিরলে, মালাকে সারা রাত তাড়া করে অমিয় নাগের, রাতের পর রাত বাড়ি না ফিরে, অন্যত্র রাত কাটানোর স্মৃতি। মালা একটা করে শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠছে, এবং জানতে পারছে, চাকরের বাথরুমে যাওয়া, সামনের বাড়ির লোকটির প্রত্যাবর্তন বা অনিদ্রাগ্রস্ত শ্বশুরের পায়চারিগুলিকে। অমিয় নাগের

¯c‡ivMx

ফেরাকে নয়। এই সমস্তই সোমনাথ শুনেছিল, এক ক্রুদ্ধ অভিযোগ স্রোতের মধ্যে মধ্যে, টুকরো টুকরো। শুনেছিল, মাস্টারমশাইয়ের জন্য সারা রাত শ্মশানে কাটিয়ে আসার পরদিন ভোরে। মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যু তেমন জোরালো কারণ ছিল না মালার কাছে। বলেছিল, কী জানি, আমার কাছেই হয় না তোমার, অন্য কোথাও হয়তো সবই আছে...আমার যা ভাগ্য...সে সবের মুখে আর পড়তে চায়নি সোমনাথ, তাই নিঃশব্দে পালিয়ে চলেছিল। সে জজকোর্টের পিছনের রাস্তা দিয়ে লুকিয়ে চলে আসছে, আর গোবিন্দগোপাল গাইছেন, বাঁশি ডাকে ওই যমুনারও কূলে আমি আসি আসি আসি বলে প্রাণ প্রাণ। সে রিকশায় উঠছে, বলছে, স্টেশন, শুনছে, বাঁশি ডাকে ওই বাঁশি ডাকে শোন, বাঁ-শি ডা-আকে...সোমনাথ পালিয়ে যাচ্ছে, রিকশায় প্রথমে, তারপর ট্রেনে, আর দেখছে, গুঞ্জন, তাড়া করছে তাকে, রিকশায় পিছন পিছন ট্রেনের দরজার বাইরে বাইরে, ট্রেনের গতিতে উড়ে চলেছে গুঞ্জন, আধো অন্ধকার গাছপালায় মাথার ওপর দিয়ে, জ্যোৎস্না ভর্তি নৈশ ধানখেতের উপর দিয়ে, কালভার্টের নীচের জলের উপর দিয়ে, উড়ে চলেছে, বাদকুল্লা, বীরনগর, তায়েরপুর স্টেশনের অফিসঘর, গুমটিঘরের উপর দিয়ে গুঞ্জন চলেছে, অর্ধেক শোনা গান তার জন্য সঙ্গে সঙ্গে শিখে নিয়ে উড়েছে গুঞ্জন। বলছে, আমার সঙ্গে এসো সোমনাথ। ঝাঁপ দাও সোমনাথ। ঝাঁপ দাও।

সোমনাথ অবশ্য দেয়নি। বাড়ির দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গুঞ্জন ফিরে গিয়েছিল সেদিন। সেদিন বাড়িতে মালা ছিল। বলেছিল, এত রাত হল যে! ওইসব গানবাজনা! উঃ।

মালা অবশ্য তার গান গাওয়াই যে বিশেষভাবে অপছন্দ করে তা নয়। সোমনাথ জানে তার কাছ থেকে মালা কিছুই পায়নি। অথচ বাবার কথায় রাজি হতে হয়েছিল তাকে। সেই নিরুপায় না-বেরোনো রাগ, এখন সোমনাথের, যে-কোনও কাজের ব্যাপারে অনিচ্ছা অপছন্দ হয়ে বেরোয়।

আজ সে-সম্ভাবনা নেই। মালা তো বাড়ি নেই আজ। আজ সারা রাত সোমনাথ গানের সঙ্গে থাকবে।

১০

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল সোমনাথ, দোতলায় আলো জ্বলছে। তার মানে মালা ফিরেছে। তার মানে আজ আর গানের সঙ্গে থাকা হবে না সোমনাথের। মালার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে একটা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বড় ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় একটু দাঁড়াল সোমনাথ, মেঝেতে কাগজপত্র ছড়িয়ে বসে মালা ভাড়ার রসিদ তৈরি করছে। ভাড়াটে তার অনেক।

সোমনাথ বলল, কখন ফিরলে?

মালা মুখ তুলে এক পলক দেখল তাকে। তারপর মুখ নিচু করে রসিদে

¯c‡ivMx

রেভিনিউ স্ট্যাম্প সাঁটতে সাঁটতে বলল, আধঘণ্টা আগে। মালার পাশে একটা কাচের গ্লাসে কোয়ার্টার গ্লাস জল। স্ট্যাম্প লাগাবার জন্য।

সোমনাথ এগোবার উপক্রম করতে মালা বলল, দেরি হল যে।

বলল, কিন্তু মুখ তুলল না।

সোমনাথ বলল, কলেজে কাজ ছিল। পরীক্ষা শেষ হল আজ।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে 'মেজাউ, মেজাউ' বলতে বলতে একটি শিশু ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোমনাথের হাঁটুর ওপর। সোমনাথ মুহূর্তে তাকে কোলে তুলে নেওয়া মাত্র শিশুটি দু হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে সোমনাথের।

টুপাই। বাপির দিদির মেয়ে। 'মেসোমশাই' উচ্চারণ করতে না পেরে 'মেজাউ' বলে সোমনাথকে।

—টুপাই, তুমি কখন এলে।

—এখন। তুমি কখন এলে।

—এখন।

—আমার জন্য কী এনেছ ?

—এনেছি তো একটা জিনিস। দুটো জিনিস। তিনটে জিনিস।

—কী কী বল ?

সোমনাথের জানা থাকে না টুপাই কবে কখন আসবে। মালা জানায় না তাকে। কিন্তু, টুপাই আসবে মনে করে সবসময়ই কিছু না কিছু এনে রাখে সোমনাথ নিজের কাছে। টুপাই সোমনাথের চুল টানে, কী বলো না। বলো না।

—এই ধরো লজেন্স।

—একটা লজেন্স ?

—উহুঁ এক কৌটো। এক বাক্স লজেন্স।

মালা বলে, এখন কিন্তু আর লজেন্স খাবে না টুপাই। এক্ষুনি অত সব খেয়ে এসেছ।

সোমনাথ টুপাইকে বলে, কী কী সব খেয়ে এলে টুপাই ?

টুপাই তার রিনরিনে গলায় বলে, নাম্বার ওয়ান চাউমিন, নাম্বার টু আইসক্রিম।

—তাই নাকি ! কোথায় খেলে ?

—কোলে।

সোমনাথ অবাক হয়ে বলে, কোথায় ?

—কোলে খেলাম। কোলে !

—কোলে খেলাম মানে। তুমি তো আমার কোলে এখন। কারও কোলে উঠে খেয়েছ বুঝি।

মালা বলে, স্টেশনের ধারে একটা দোকান হয়েছে না, নতুন। 'কোয়েল'। ওই কোয়েলের কথা বলছে। টুপাই এলে, তবু তার আর মালার মধ্যের

¯c‡ivMx

ভয়ানক শৈত্য একটু কাটে।

সোমনাথ বলে, তা তুমি একা একাই অত সব খেলে টুপাই, আমার জন্য কিছুই আনলে না।

মালা বলে, তোমার খাবার রান্নাঘরে আছে। গরম করে নিতে হবে।

সোমনাথ আর মালার মধ্যে দিনের পর দিন কথাবার্তা হয় না কিছু। সকালে চা করে সোমনাথ শুধু ডেকে দেয় মালাকে। ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকে টেবিলের পাশে এক গ্লাস জল আর এক কাপ চা নিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, চা এনেছি। এই যে, তোমার চা।

মালা আধ ঘুমন্ত অবস্থা থেকে বলে, থাক ওখানে।

—আচ্ছা।

সোমনাথ চলে যায়। কোনও কোনও দিন যদি একটু আগেই রান্নার লোকটি এসে যায়, তবে সোমনাথ বলে, মিনতি এসে গেছে। পাঠিয়ে দেব।

মালা বলে হ্যাঁ।

সোমনাথ চলে আসে।

টুপাই সোমনাথের চুল ধরে টানল। কী এনেছ দাও!

—চলো, ঘরে যাই আগে।

সোমনাথের কোলে চড়ে টুপাই সোমনাথের ঘরে আসে। সোমনাথ তাকে বিছানায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তারপর কোনও গোপন আস্তানা থেকে বার করে দিতে থাকে— এই নাও, একটা জিনিস, লজেন্সের বাক্স। এই হল দু নম্বর জিনিস রঙ পেন্সিলের বাক্স। আর এই হল তিন নম্বর আঁকবার খাতা।

টুপাই তিনটে জিনিসই একসঙ্গে হাতে সাপটে ধরতে যায়। লজেন্সের বাক্স বেশ বড়, আর আঁকার খাতা বেশ লম্বা। তারা ফসকে কেবলই খাটে পড়ে যায়।

সোমনাথ বলে, তুমি এখানে বসে থাকো একটুখানি, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসি, কেমন!

হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে এসে সোমনাথ দেখল টেবিলে চাপা দেওয়া দুটো পরোটা আর একটা বাটিতে মাংস। দোকানের রান্না। লালচে-কালো ঝোল। তেল ভাসছে উপরে। এই ধরনের রান্না খেতে ইচ্ছে করে না সোমনাথের। মালার আবার এইগুলোই বেশি পছন্দ। যদিও সোমনাথকে প্রায়ই হোটেলে খেতে হয়, তবু সে সাধাসিধে খাবারই পছন্দ করে। আজ এই মাংস দেখেই আর খেতে ইচ্ছে হল না তার। থাক। কাল সকালে রান্নার লোককে দিয়ে দেবে। তার খাওয়াদাওয়ায় রুচি অরুচির ব্যাপারটা মালার জানা নেই। সেও জানাবার চেষ্টা করেনি কখনও। সোমনাথ, একটা পরোটা, একেবারে এমনিই একটা পরোটা মুড়িয়ে চিবোতে চিবোতে ঘরে এল। টুপাই বিছানার উপর রঙ পেনসিল আর খাতা ছড়িয়ে বসেছে। দু পা ছড়ানো। আঁকছে।

সোমনাথ ঝুঁকে পড়ে, কী আঁকলে দেখি, টুপাই।

¯c‡ivMx

এটা কী ?

—মেজাউ !

—মানে।

—মেজাউকে এঁকেছি।

—মেজাউ মানে কী ? আমি !

—হ্যাঁ।

—এটা তা হলে কী !'

—শিং। মেজাউয়ের শিং।

—আমার শিং আছে বুঝি !

—আছে !

—আর এটা কে ?

—টুপাই !

—টুপাই কী করছে ?

—টুপাই ঘুমচ্ছে। আমি ঘুমব। ঘুম পেয়েছে।

টুপাই শুয়ে পড়ে।

সোমনাথ ব্যস্ত হয়, দাঁড়াও টুপাই দাঁড়াও ! একটু। ওঠো তোমাকে ওঘরে শুইয়ে দিয়ে আসি।

টুপাই বলে, না। এখানে। এখানে শোব। তুমি বোসো না। বোসো।

সোমনাথ বসে বিছানায়।

—আঃ। বাবু হয়ে বসো। বাবু হয়ে।

সোমনাথ বসে তা-ই। তার হাঁটুর ওপর মাথা দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে পড়ে টুপাই। এটা টুপাইয়ের একটা প্রিয় অভ্যেস। মেজাউ বাবু হয়ে বসবে, আর তার কোলে মাথা রেখে ঘুমবে টুপাই। নড়লে চড়লে হবে না। একটুতেই ঘুম ভেঙে যাবে তার। তখন কান্নাকাটি।

তাই প্রথম আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ওইভাবে বসে থাকতে হবে। তারপর, মেয়ে ঘুমলে, তাকে পাশের বালিশে সরিয়ে দিতে হবে বা কোলে করে দিয়ে আসতে হবে তার মাসির ঘরে।

সোমনাথ কাঠ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। ঘুমিয়ে পড়ুক আগে। তারপর সন্তর্পণে, চারপাশের কাগজ খাতা পেন্সিল লজেন্সের বাক্স ধরে ধরে পাশের টেবিলে রাখতে লাগল। একটু নড়াচড়া হলে বা আওয়াজ হলে জেগে উঠবে। সোমনাথ বিছানা পরিষ্কার করে ফেলল। তারপর খুবই আস্তে আস্তে একটু পিছনে সরে নিজের পিঠটা খাটের পাশের দেওয়ালের সঙ্গে লাগাতে পারল সে। ব্যস। এই বার একটু আরাম। ঠেস দিয়ে বসা যাবে। মশারিটা টাঙানো হল না। মেয়েটার পায়ে একটা দুটো মশা বসছে। যদিও ফ্যান ঘুরছে জোরেই। পরে মশারিটা টাঙাতে হবে। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে আঁকার লম্বা খাতাটা তুলে, টুপাইকে হাওয়া করতে লাগল সোমনাথ। দেখতে লাগল

¯c‡ivMx

টুপাই-এর ঘুম যেন না ভাঙে।

গান গাওয়া ছাড়া, পৃথিবীতে এই একটা কাজ করেই সে গান গাওয়ার আনন্দ পায়। এই টুপাইয়ের দেখাশোনা করা। এ সব সময়ে তার মনে হয় তার দুটো হাতের মধ্যে যেন স্বর্গ নেমে এসেছে। এই যে টুপাই শুয়ে আছে তার কোলে গাল রেখে, বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বুকের ছোট্ট একটুখানি খাঁচাটা উঠছে নামছে একটু। গলার কাছে বিকেলের পাউডার উঠে গিয়েও অস্পষ্ট লেগে রয়েছে, এই সমস্ত দৃশ্যটা তার বুক ভরে দিচ্ছে। এই যে টুপাইয়ের নরম চুল তার আঙুলে লাগছে। কিংবা ওই যে, সে বাড়ি আসা মাত্র টুপাই যখন তার হাঁটুতে নরম মুখ গুঁজে দিয়েছিল আর কোলে উঠে গলা জড়িয়ে ধরেছিল সে সব মুহূর্ত মনে করে, সেই সব স্পর্শের শান্তি মনে করে যেন ঘুম এসে যাচ্ছে তার। আর এইভাবে টুপাইয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, তার গালের উপর থেকে একটা দুটো মশা টোকা দিয়ে উড়িয়ে দিতে দিতে, সত্যিই একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সোমনাথ। দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে, বাবু হয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়ল কখন।

এ কী ! এ কী ছিরির ঘুম !

সোমনাথ চোখ খুলে দেখল দরজায় মালা। স্নান করেছে। পরনে নীল রঙের একটা ম্যাক্সি।

—কোনও একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই, এই বেকায়দায় ঘুমচ্ছে দুজনে, পায়ে খিল লেগে যাবে যে।

সোমনাথ লজ্জিত হয়। সত্যিই তো টুপাইয়ের একটা পা বেঁকে আছে একটু।

সোমনাথ বলে, বুঝতে পারিনি, ওর পাটা ... বলে, টুপাইয়ের পা সোজা করে।

—ওর কথা হচ্ছে না। তোমার। তোমার পায়ের কথা হচ্ছে। ওইভাবে বাবু হয়ে বসে ঘুমচ্ছ, কতক্ষণ। শুনি ! তারপর ধড়মড়িয়ে উঠতে গেলে পায়ে শিরটান লাগবে। ছিঁড়েও যেতে পারে। কত কিছু হতে পারে। নাও। পা সোজা করো ।

সোমনাথ, ধীরে ধীরে, টুপাইয়ের মাথার পিছনে হাত দিয়ে মাথাটা বালিশে নামায়। তারপর নিজের পা দুটো টান করে। সত্যিই ঝিঁ ঝিঁ ধরেছে বটে।

মালা বলে, আমার বাবার একবার হয়েছিল ওইরকম। আমাকে কোলে নিয়ে ওইরকম বোকার মতো বাবু হয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর উঠতে গিয়ে পায়ে এমন লাগল, ডাক্তার-বদ্যি করতে হল, খোঁড়াল কতদিন !

সোমনাথ একটু অবাক হয়। বলে, তোমার ঘরে দিয়ে আসি ওকে।

মালা বলে, থাক, এ ঘরেই থাক আজ। উঠেই তো আবার কান্না জুড়বে।

¯c‡ivMx

মশারিটা টাঙিয়ে নাও।

সোমনাথ বলে, নিচ্ছি।

মালা বলে যায়।

সোমনাথ মশারি টাঙায়। সোমনাথের ঘরে ছোট আলো নেই। সোমনাথ ঘর অন্ধকার করে শোয়। কিন্তু মেয়েটা ভয় পেতে পারে। সোমনাথ পাশের ঘরে গিয়ে পড়ে থাকা, ব্যবহার না হওয়া, টেবিল ল্যাম্পটা নেড়ে চেড়ে দ্যাখে। হ্যাঁ, বাল্‌ব তো একটা আছে। প্লাগ লাগিয়ে দেখে জ্বলছে। এ ঘরে এনে আলো নিভিয়ে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে দেয়। আলোটা বেশ। বেশিও নয় কমও নয়। মশারিতে ঢুকে পড়ে সোমনাথ। টুপাইয়ের মুখের দিকে তাকায়। পরের মেয়ে। ক'দিন পরেই চলে যাবে! ক'দিন? কালও হতে পারে। পরশুও হতে পারে। সাতদিন বাদেও হতে পারে। সবই মালার ইচ্ছে। তবে আশ্চর্য, আজ হঠাৎ, এত বছর বাদে, মালা তার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করল। কেন? মালার বাবা মালাকে কোলে শুইয়ে ঘুমতেন সেটা মনে পড়ে গেল বলে? কী জানি!

টুপাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, হয়তো কালই চলে যাবে। সোমনাথ কোনও কথাই বলবে না। কী স্বপ্ন দেখছে এখন টুপাই! স্বপ্নরাজ্য হতে এসে ভেসে স্বপ্নরাজ্য দেশে যাই আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই।

হঠাৎ চমকে উঠল সোমনাথ। টুপাইয়ের কপালে একটা টিপ। লম্বা, ঈষৎ লাল রঙের, একদিকে বেঁকে আছে। মালা পরিয়েছে ওকে? নাকি ও নিজেই মাসির ড্রেসিংটেবিলের আয়না থেকে তুলে পরেছে ওই প্ল্যাস্টিকের টিপ।

ওই টিপ, ওইরকম বাঁকা হয়ে ছিল আজ।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জির কপালে।

মাথার ভেতরটা কেমন যেন হয়ে যায় সোমনাথের!

পৃথিবী এত আশ্চর্য!

পৃথিবী এত সুন্দর!

সোমনাথ বুক ভরে শ্বাস নিল। তারপর মুখ তুলল। পর্দা ঢাকা জানলার উপর দিয়ে তার চোখ গেল বাইরে। বাইরে গাছ। মনে মনে বাইরেটা দেখতে পেল সোমনাথ। কাল রাতে ছাদে থাকার সময় চাঁদ ছিল আকাশে। প্রায় পূর্ণ চাঁদ। আজও থাকবে তা হলে। মশারির বাইরে এসে টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিল সোমনাথ। সরিয়ে দিল পর্দা। সোজাসুজি জ্যোৎস্না এসে পড়েছে টুপাইয়ের মুখে। মশারির ভেতরে মায়ালোক। বুকে ঢেউ লাগে সোমনাথের। গানের অদৃশ্য নদী বয়ে চলেছে সব সময়। আমাদের শ্রুতির বাইরে দিয়ে। দৃষ্টির আড়াল দিয়ে বয়ে চলেছে। আমরা যেতে পারি না। বেশিটাই আমাদের জানার বাইরে থেকে যায়। তবু শ্রুতি পেতে রাখলে, কচ্চিৎ কখনও শুনতে পাওয়া যায়। সোমনাথ এই মুহূর্তে পাচ্ছে।

¯c‡ivMx

ঘুমন্ত টুপাইয়ের মুখে এই জ্যোৎস্না।

এও এক গান।

মশারির ভেতরে ওই মায়ালোক।

এও এক গান।

জানলার বাইরেও মায়ালোক।

নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো। সোমনাথ বারান্দার কাছে এল, গাছে পাতায়, দূরে ভাঙা বাড়ির মাথায়, মাঠের ওপারে মাঠে চাঁদ তার সন্তান-স্নেহ ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীর ওপর।

কিন্তু পৃথিবী কি চাঁদের সন্তান!

তা তো নয়।

সোমনাথের বাবা কি সোমনাথের সন্তান।

শুয়ে পড়ার আগে জানলায় এসে দাঁড়াল সোমনাথ। চোখ পড়ল নীচে উঠোনে। একতলায় বারান্দার ধারে, উঠোনের পাশে, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে একটি নারীমূর্তি। বাইরে জ্যোৎস্না, কিন্তু সেই জ্যোৎস্না এতদূর থেকে তার মুখ দেখবার মতো যথেষ্ট নয়। তবু দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে তাকে চিনতে পারা যায়।

হ্যাঁ, রুমা।

এতখানি জ্যোৎস্নার মধ্যেও সে দাঁড়িয়ে আছে সন্ধেবেলার অন্ধকার কোনও ফুলগাছের মতো!

১১

কলেজ, পরীক্ষার পর বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অফিস খোলা। ছুটির শেষের দিকে অডিটর আসবে। সোমনাথকে রোজ আসতে হচ্ছে তাই। উমাপদবাবু মধ্যে মধ্যে আসছেন। আজ সোমনাথ দেখল, সুবীরবাবু এসেছেন। সেই সঙ্গে ইংরেজির আরও একজন। তাঁর কাছে জানতে পারল সোমনাথ যে অনার্সের স্টুডেন্টদের স্পেশাল ক্লাস করাচ্ছেন তাঁরা। সপ্তায় দুদিন।

এবারের গ্রীষ্মকে, মধ্যপর্ব ছাড়িয়ে যাবার পর, সর্বাপেক্ষা প্রখর মনে হচ্ছে। প্রতি বছরই এমন মনে হয়। মনে হয়, এবার যেন কালবৈশাখী হলই না। এমন বলাবলি শুনছে সোমনাথ। রাত্রে যদিও খুব ভাল হাওয়া থাকে। আজ কলেজে আসবার সময় দেখেছে, মাঠের ঘাসগুলো রোদ্দুরের মুখে পড়ে জ্বলতে শুরু করেছে যেন। সোমনাথ উমাপদবাবুর কাছ থেকে কী একটা মোটা খাতা দু হাতে ধরে নেবার সময় দেখল, শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি ঘরে ঢুকতে গিয়ে তাকে দেখে থমকে গেল। সোমনাথ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু বলছেন, দিদিমণি!'

¯c‡ivMx

—অ্যাঁ ? হ্যাঁ ! মানে সুবীরদারা কি এসেছেন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেকক্ষণ। ফার্স্ট ইয়ারের ঘরে আছেন। খবর পাঠাব ?

—না থাক। আমাদের ঘরটা খোলা আছে কি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, যান ! মণিকাঞ্চনবাবু আছেন ওখানে।

উমাপদবাবুর সঙ্গে আবার কাজে ডুবে গেল সোমনাথ। এবং উমাপদবাবুও যথারীতি একটু পরেই চলে গেলেন। প্রিন্সিপ্যাল কাছেই থাকেন, বাড়ি প্রায় দেখা যায় এখান থেকে। তিনি ঘুরে চলে গেছেন। সুবীরবাবু, শ্যামশ্রী, এরাও বেরিয়ে গেলেন কিছু পরে। সোমনাথ বেয়ারাকে বলল, তুমি চলে যাও পরেশ, আমি দরজা আটকে দারোয়ানকে চাবি দিয়ে চলে যাব। একা একা কাজ করতে, নিস্তব্ধতার মধ্যে কাজ করতে ভাল লাগে সোমনাথের। তাতে কাজটা এগোয়।

এই সময় জোর একটা হাওয়া এল। সঙ্গে ঠাণ্ডা ঝলক। সোমনাথ কাগজপত্রে পেপারওয়েট চাপিয়ে, উঠে এদিকের বড় জানালাটা বন্ধ করে ওদিকটায় গেল। গিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল।

বৃষ্টি আসছে।

পুরো কলেজের মাঠ পেরিয়ে বৃষ্টি আসছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে পার হয়ে ওপারের রেললাইন পার হয়ে, তার পিছনের আমবাগানের মাথার উপর দিয়ে বৃষ্টি আসছে। তার সঙ্গে উড়ে আসছে গুঞ্জন। দুপুরে যে ঘাসগুলোকে রৌদ্রঝলকিত দেখেছে সোমনাথ তারা এখন মেঘলা সবুজ মাটি হয়ে গেছে যেন। হই হই করে বৃষ্টি এসে পড়ল।

ঘরে ঢুকে পড়ল গুঞ্জন। সোমনাথ শুরু করল !

মাঠে মাঠে ঢাকে মাটি সবুজ মেঘে মেঘে
কখন বাদল ছোঁওয়া লেগে কখন
বাদল ছোঁয়া লেগে ...

রবীন্দ্রনাথের গান। বৃষ্টির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে লাগল সোমনাথ খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে। বৃষ্টির ছাঁট তার মুখে এসে লাগছে। সে দেখছে ঘাস ভিজে উঠছে। ঘন ঘাসের রঙ বদলাচ্ছে মেঘ জলের রঙের সঙ্গে।

ওই ঘাসের ঘন ঘোরে
ধরণীতল হল শীতল
চিকন আভায় ভরে
ওরা হঠাৎ গাওয়া গানের মতো এলো
এলো প্রাণের বেসে
হা-আ-রে কখন বাদল ছোঁয়া লেগে
কখন বাদল ছোঁয়া লেগে

হঠাৎ কী মনে হতে পিছনে তাকাল সোমনাথ।

¯c‡ivMx

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি।

হাতের ছাতাটা উল্টে গেছে। কপালে মুখে শাড়িতে বৃষ্টির ধাক্কা। চুল খানিকটা ভেজা। কোথাও বা ধূসর, উস্কো চুলের উপর জলের বিন্দু। অজস্র বিন্দু। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তার পিছনে।

দুজনে স্তব্ধ তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। এই হল সেই কয়েক মুহূর্ত যাকে বলে অনন্তকাল।

সোমনাথই প্রথমে কথা খুঁজে পায়। এ কী। দিদিমণি, আপনি!

শ্যামশ্রী কোনও কথা বলে না।

সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে চেয়ার এগোয়। বসুন, বসুন দিদিমণি!

শ্যামশ্রী বসে, কিন্তু কোনও কথা বলে না।

সোমনাথ বলে, দিন, ছাতাটা দিন আমাকে। শ্যামশ্রী ছাতাটা এগিয়ে দেয়। সোমনাথ অল্প চেষ্টাতেই সেটাকে স্বাভাবিক করে। সোমনাথ বলে, আপনারা তো অনেকক্ষণ বেরিয়েছিলেন দিদিমণি, হঠাৎ আবার ফিরে এলেন কী করে।

শ্যামশ্রী এবারও কোনও কথা বলে না। তার চশমার কাচ অজস্র জলবিন্দুতে আচ্ছন্ন। কিন্তু সেই চশমা চোখ থেকে নামায় না বা মোছে না সে।

সোমনাথ এবার একটু ভয় পায়, কথা বলছেন না কেন দিদিমণি, আপনার শরীর অসুস্থ লাগছে না তো?

শ্যামশ্রী বলে, আমাকে দিদিমণি বলে ডাকলে আমি কথা বলব না।

সোমনাথ চুপ করে যায়। বাইরে বৃষ্টি বাড়ল। ঘরে আলো জ্বালিয়ে দেয় সোমনাথ। শ্যামশ্রীর চশমার কাচে জলবিন্দু চিকচিক করে।

সোমনাথ কথা খুঁজে না পেয়ে বলে, জল খাবেন? জল দেব?

—দিন।

সোমনাথ ঘরের কোণে গিয়ে জল ভরে। শ্যামশ্রী বলে, অনেক দিন রোদ্দুরের পর আজ দুপুরে মেঘ করল বলে, রাস্তায় ওই চায়ের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে, মণিকাঞ্চনবাবু আর সুবীরদার সঙ্গে গল্প করলাম। তারপর ঠাণ্ডা হাওয়া শুরু হতে রিকশায় উঠে স্টেশনের দিকে এগোতেই ভীষণ বৃষ্টি এল, রিকশার সামনে ঢাকা ছিল না। দেখলাম একদম ভিজে যাব। রিকশাওলাকে বললাম কলেজে ফিরিয়ে দাও। এসে দেখি, আপনি... আপনি গান গাইছেন।

সোমনাথ বলল, এত বৃষ্টি, যে ওদিকের চায়ের দোকানটা ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে নিশ্চয়। একটু চা খেলে অন্তত ...

—এই গানটা কার কাছে শিখেছেন?

—শিখিনি তো। শুনেছি।

—কার কাছে শুনেছেন? আপনার সেই মাস্টারমশাই, তাঁর কাছে?

¯c‡ivMx

—না, সৌমেন চক্রবর্তীর কাছে।

—সৌমেন চক্রবর্তী ? যিনি বাউলদের নিয়ে লেখেন !

—হ্যাঁ।

—কতদিন লেগেছিল গানটা তুলতে !

সোমনাথ অবাক হয়, তুলতে ? আমি একদিন শুনেছিলাম ওঁকে গাইতে। উনি শুনিয়েছিলেন আমাদের।

—ব্যস। একদিনেই উঠে গেল। আপনি তো শ্রুতিধর।

সোমনাথ মাথা নামাল। 'শ্রুতিধর' একদিন তাকে সৌমেন চক্রবর্তীও বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গান শৈল ঘোষাল গাইতে চাইতেন না। বলতেন, ওই গানের ঢঙ আলাদা। সুবিচার করতে পারব না। সোমনাথ রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছে রেডিওতে। আর সৌমেনবাবু শোনাতেন ওই গান। মাস্টারমশাইয়ের ঘরে বসবার সময়। তা ছাড়া আলেখ্য স্টুডিওতে বসে। জজকোর্টের মাঠে বসে। আকাশে তারা ওঠার সময় শোনাতেন।

চুপ করে শুনে গেছে সোমনাথ। আর বুঝেছে, জীবনে এমন সব সময় আসে যখন, রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই হয়। জীবনে আকস্মিকের আঘাত যখন আসে তখন গাইতে হয়। যেমন মাস্টারমশাইয়ের মৃত্যুর পর, তাঁর চিতার সামনে তার গলায় উঠে এসেছিল রবীন্দ্রনাথেরই গান।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জিকে তো এত কথা বলা যায় না।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি বলল, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন ! বসবেন না।

—হ্যাঁ। বসি।

একটু দূরের একটা চেয়ারে বসে সোমনাথ।

—তখন যে গানটা আমার জন্য থামিয়ে দিলেন আর একবার করবেন ?

—না, মানে, আপনার জন্য তো থামাইনি।

—হ্যাঁ আমারই জন্য। করবেন একবার ?

সোমনাথ মাথা নামাল। নিজের হাতের পাতার দিকে তাকিয়ে বসে রইল চুপ করে। ঘোর একবার ভেঙে গেলে গান হয় না আর। গুঞ্জন আর আসবে না এখন।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি বলল, বুঝতে পারছি করবেন না। আচ্ছা, সেদিন, আমাদের প্রোগ্রাম না শুনে আপনি পালিয়ে এলেন কেন !

সোমনাথ সুবীরবাবুকে বলবার জন্য সযত্নে তৈরি করে রাখা অজুহাতটা সসংকোচে শ্যামশ্রীকেই দিল, মানে, আমার বাড়িতে সেদিন কেউ ছিল না। তাড়াতাড়ি ফেরার দরকার ছিল। তা ছাড়া বেরিয়েছিলাম তো ন'টার আগে।

—কেন ? অত আগে বেরিয়েছিলেন কেন ?

—পরীক্ষা তো দশটায় শুরু।

—তার আগে গোছগাছ করা ছিল তো।

শ্যামশ্রী এতক্ষণে বেশ স্বাভাবিক, চশমা খুলে মুছে নিয়ে আবার পরল।

¯c‡iÖÖ

তারপর জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন ?

—আমি আর আমার স্ত্রী ।

—আপনার স্ত্রীও কি গান করেন ?

সোমনাথ কোনওমতে বলল, না, না ।

—তা হলে, আপনার স্ত্রী নিশ্চয়ই খুব গান ভালবাসেন। যাঁর স্বামী এত গুণী !

সোমনাথ এরকম কথার সামনে কখনও পড়েনি। পড়বে বলে ভাবেওনি। ফলে কোনও অজুহাত খাড়া করতে পারল না, বলে ফেলল, তা তো বটেই ইয়ে...মানে...হ্যাঁ ।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি বলল, আমি ভাবছি সেই মহিলার কত আনন্দ যিনি সারা দিন আপনার সঙ্গে থাকেন, আপনার গান শোনেন !

সোমনাথ ছটফট করে উঠে পড়ল, জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কোনওমতে বলল, হ্যাঁ। কিন্তু, কী আশ্চর্য বৃষ্টিটা এখনও থামছে না কেন ? যেন বেড়ে চলেছে কেবলই। আপনি বাড়ি ফিরবেন কী করে দিদিমণি ?

—তুমি আমাকে দিদিমণি বল কেন ?

সোমনাথ চমকে ঘুরে তাকায় ।

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি তাকিয়ে আছে তার দিকে। ঠিক সেই তাকানো নয় যে-তাকানো সোমনাথ গান রিওয়াইন্ড করে ফিরিয়ে এনেছিল মানসচক্ষে। অন্য রকম। বিপর্যস্ত তাকানো ।

—কবে পড়েছিলে তুমি আমার কাছে, যে আমাকে তুমি দিদিমণি বলো !

সোমনাথ স্তব্ধ হয়ে থাকে। ঠিক এই সময় একবার একটু বেড়েই নিভে যায় ঘরের আলো। হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি এসে আছড়ে পড়ে দরজায়। ছাঁট ভেতরে আসে। সোমনাথ বোঝে, কাগজপত্র গোছানো দরকার। দ্রুত সে দরজার একপাল্লা আটকায় চেয়ার দিয়ে। তারপর কাগজপত্র গুছিয়ে তুলতে থাকে। মন স্থির করো ! সোমনাথ মন স্থির করো ! কাগজপত্র গুছিয়ে নিজের ড্রয়ারে চাবি দেয় সে। উঠে আসে দরজার সামনে। ভয়ানক কালবৈশাখীতে শেষ দুপুরের আকাশ কালো মেঘের মতো হয়ে সন্ধে আনছে যেন।

দারোয়ান কই ! আসছে না কেন ? দারোয়ানজি কা ঘর কাঁহা ?

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি উঠে এসে দাঁড়ায় তার সামনে।

—তোমার স্ত্রীকে তুমি খুব ভালবাস, না ? সব গান তাকে শোনাও ? সোমনাথ থর থর করে কাঁপে।

—তার থেকে একটা দুটো গান অন্য কাউকে শোনানো যায় না। অন্য কেউ মানে এই আমি। আমাকে শোনানো যায় না !

সোমনাথ স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকে !

শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি তার জামাটা চেপে ধরে। বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে যত ভালবাস, তার থেকে একটু, একমুষ্টি ভালবাসা অন্য কাউকে দেওয়া যায় না ?

¯c‡ivMx

হ্যাঁ ? অন্য কেউ মানে কে জানো ? অন্য কেউ মানে এই আমি। আমাকে দেওয়া যায় না ! আমাকে ! আমাকে !

দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে সোমনাথের। তার বুকের উপর শ্যামশ্রী ঘনিয়ে এসেছে। একদিকে পাল্লা ভেজানো, একদিকের খোলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে তারা। যে কোনও মুহূর্তে যে কেউ ঢুকতে পারে। 'দরোয়ানজি কা ঘর কাঁহা ?' কিন্তু, কেউ ঢুকবে না। বৃষ্টি নিজে পাহারা দিচ্ছে। ঝড় আটকে রেখেছে সমস্ত সম্ভাব্য বাধা। সোমনাথের বুকে গাল রেখে বলছে একটি নারী। সুর, তুমি নিজে সুর, তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছ। তোমাকে দেখেছি রাস্তায়, রিকশায়, করিডরে...সুইং ডোরের ওপার থেকে দেখে গেছি দিনের পর দিন। তুমি চোখ নামিয়ে নিয়েছ। আমি তোমাকে স্বপ্ন দেখি রোজ। তুমি জানো শরীর একটা গান। প্রেমের শরীর সেও গান।

সোমনাথের মাথা আচ্ছন্ন হল। সোমনাথ দু'হাত দিয়ে তুলে ধরল সেই মুখ। তার দুই গালে দুই হাত রেখে দেখতে লাগল সোমনাথ। বড় বড় চোখ, আকুল দৃষ্টি, নাকের পাটা ফুলছে, তাতে বৃষ্টি নাকি ঘামের বিন্দু। ঠোঁট অর্ধেক খোলা, সেই ঠোঁট কী বলছে ? তার গালের ওপর নরম দুটো হাতের স্পর্শ। সেই ঠোঁট তাকে বলছে, কী সুন্দর ! উঃ ! কী সুন্দর !

একটু থামল সোমনাথ, বলল, সুন্দর ! কী !

—এই লোকটা ! এই লোকটা !

সোমনাথের মাথায় আগুন খেলা করছে। কপালে বিধ্বস্ত টিপ। কী যেন একটা চেনা-চেনা ভাব ভেসে চলে গেল।

সোমনাথের মুখ এগিয়ে আসতে লাগল অপর মুখটির দিকে আর তার চোখে পড়ল আঁচিল। থুতনির পাশে একটা আঁচিল।

তৃষ্ণা চৌধুরী। রেকর্ডের কভার থেকে তাকিয়ে আছেন। বিদ্যুতে বিদ্যুতে তার মাথার ভেতর চমকে উঠল তৃষ্ণা চৌধুরী :

গান
শৈল ঘোষাল
বাবা
প্রতিশ্রুতি
হরিসাধন
প্রতিশ্রুতি
টিপ
টুপাই...

মুখ তুলে তাকাল সোমনাথ, চুম্বনের পূর্ব মুহূর্তে মুখ তুলে তাকাল।

বৃষ্টি পাগলের মতো ঝরছে। জানলার বাইরে।

নারী তাকাল, এসো !

সোমনাথ বলল, সরস্বতীকে চুম্বন করতে নেই।

¯c‡ivMx

নারী বুঝতে পারল না, বলল, মানে ?

পুরুষ বলল, সরস্বতীকে অন্যরকম হাতে ছুঁতে নেই।

নারী বলল, ছুঁতে নেই আমাকে ! আমাকে প্রত্যাখ্যান করছ ?

পুরুষ বলল, সরস্বতীকে প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

—কে সরস্বতী ? সরস্বতী কোথায় ?

—তুমি সরস্বতী। তোমার মধ্যে গানের দেবী বসে আছেন।

—গানের দেবী বলে কিছু নেই। প্রকৃতি আছে। প্রকৃতি মানুষের মধ্যে প্রতিভা ঢেলে দেয়। কোনও কোনও মানুষের মধ্যে। তুমি সেইরকম মানুষ। এসো, তোমার প্রতিভা দিয়ে স্পর্শ করো আমাকে ! ওই ওষ্ঠ, ওই জিহ্বা, যা গান উচ্চারণ করেছে সেই ওষ্ঠ আমার ওষ্ঠে দাও। বৃষ্টিকে সামনে রেখে চুম্বন করো আমাকে।

—সরস্বতীকে চুম্বন করা যায় না।

—তুমি শিল্পী না তুমি নপুংসক ? তুমি প্রতিভাবান না তুমি কাপুরুষ ? তুমি কী ! তুমি কী !

তুমি যা খুশি মনে করতে পারো। কিন্তু আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

—কৃতজ্ঞ !

—হ্যাঁ, তোমার মধ্যে গানের দেবী বসে আছেন।

—উঃ, গানের দেবী। গানের দেবী। গানের দেবী বলে কিছু নেই।

—আছেন। সেই গানের দেবী তোমার ভেতরে অবস্থান করে আমাকে রক্ষা করেছেন। রক্ষা করেছেন সত্যভঙ্গ থেকে। সেইসব মৃত পরিজনরা, যাঁদের কাছে আমি সত্য করেছিলাম, যাঁরা পরলোক থেকে আমাকে দেখছেন, যাঁরা মৃত্যুর ওপারে গিয়েও আমাকে ভুলে যাননি, যাঁরা ভালবেসেছেন আমাকে, যাঁরা ভালবেসেছিলেন সন্তানদের, এমন কি দূরতর আত্মীয়ের সন্তানদের, আত্মীয়ের আত্মীয়ের সন্তানদের ভালবেসেছিলেন যাঁরা, যাঁরা আমাকে দিয়ে সত্য করিয়েছিলেন, নিরুপায় হয়েও, আমাকে দিয়ে, যারা আমাকে সত্য করাবার যোগ্য মনে করেছিলেন, তাঁরা সব, ওই বৃষ্টির ওপারে, বৃষ্টির ওপরকার আকাশে দাঁড়িয়ে আছেন আজ। এমন কি বৃষ্টির সঙ্গে সামনের ওই মাঠেও কেউ কেউ হয়তো নেমে এসেছেন আজ ! আমার মতো পরিজন তাঁরা, তাঁদের সত্য আমার কাছে। আর আমি নপুংসক কি না, কাপুরুষ কি না, সে-প্রমাণ হয়তো এ জীবনে দেওয়া হল না। কিন্তু আমার মৃত পরিজনদের সত্য আমার কাছে রাখা রইল। আর আমার জীবিত পরিজন, একমাত্র জীবিত, আত্মীয়া আমার, আমার স্ত্রী, সেও এক দুর্ভাগা। কেননা সে গানকে ভালবাসতে পারেনি, কারও কাছে কোনও সত্য করতে পারেনি। আর যাকে ভালবেসেছিল, সর্বস্ব দিয়েই ভালবেসেছিল, সেও কেবল লুণ্ঠন করেছিল তাকে। ছিন্নভিন্ন করেছিল তাকে। আর আমি, তার দ্বিতীয় স্বামী, আজ এ কথা স্বীকার করব, যে আমিও তাকে ভালবাসতে পারিনি। প্রতিশ্রুতি পালন করেছিলাম মাত্র। কিন্তু, সে তবু,

¯c‡ivMx

অন্যের শিশুকে কোলে তুলেছে। সে আমার ঘুমের ভঙ্গি নিয়ে উদ্বেগ জানায়। আমাকে ঘুমন্ত দেখে তার নিজের বাবাকে মনে পড়ে...

এরা সব কী। এরা সব অন্ধকার ফুল গাছ। আমরা সবাই। যারা ভালবাসবার অধিকার পাইনি। যারা সঙ্গীত কল্পনা করেছি, কিন্তু গাইবার সামর্থ্য পাইনি। আমাদের সামর্থ্যের ওপারে দাঁড়িয়ে থেকেছে প্রেম। সামর্থ্যের ওপারে দাঁড়িয়ে থেকেছে গান। এই বৃষ্টির মাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর জলভর্তি মাঠের মধ্যে ঠায় থেকে গেছি আমরা। এক একটা অন্ধকার ফুল গাছ হয়ে হয়ে। এর মধ্যে আমরা সবাই আছি। আমি, আমার বাবা, আমার মা, মাস্টারমশাই। আর আমার স্ত্রী, ওই মালাও। সবাই অন্ধকার ফুলগাছ। খুঁজে খুঁজে দেখতে হয় আমাদের। তবু গান, সুগন্ধ রৌদ্রকিরণ আমাদের মধ্যেই এসে লুকিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে। তাই দেখা যায় না। আমরা, কেউ কেউ, দু-একটা সত্যের বেশি হয়তো কিছুই রক্ষা করতে পারি না জীবনে। কিন্তু দু-একটা সত্যের কমও কিছু রক্ষা করতে পারি না। দু-একটা অন্ধকার ফুলগাছের সত্য...

সোমনাথ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। বৃষ্টির ছাঁটে তার মুখ এতক্ষণ ধরে ভিজছে। বৃষ্টি কমে আসছে ধীরে ধীরে। সোমনাথ এতক্ষণ একটা কথাও বুঝি বলেনি। না কি বলেছে, সব ? সোমনাথ জানে না। কিন্তু তার মাথার ভেতর দিয়ে এসব সংলাপ বয়ে গেছে। সে স্পষ্ট শুনেছে। সে স্পষ্ট শোনেনি। এ কথা সত্যি না মিথ্যে সে জানে না। এই ঝড় বৃষ্টি ছাড়া কেউ জানে না সে কথা।

সোমনাথ ঘুরল। ঘর ফাঁকা। ঘরে কেউ নেই। শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি চলে গেছে। শ্যামশ্রী চ্যাটার্জি কি সত্যি এসেছিল !

১২

সোমনাথ, সন্ধের পর বৃষ্টি ভিজে বাড়ি ফিরল যখন, দেখল, রুমাদের বারান্দায় ভিড়। জনাচারেক অচেনা লোকজন। তার মধ্যে দু'জন বয়স্ক মহিলাও আছেন। সেখানে রুমার বাবা মা, আর মালাও দাঁড়িয়ে। মালা বলছে, কী হয়েছে তাতে। এত দুর্যোগের মধ্যে কেউ যায় ? আমি নীচের ঘরটা খুলে দিচ্ছি।

সোমনাথকে দেখে, রুমার মা বললেন, এঃ একেবারে ভিজে গেছেন দাদা।

রুমার বাবা বললেন, ট্রেন চলতে শুরু করেছে কিনা কিছু জানেন ?

মালা বলল, ও কী করে জানবে ? ও তো কলেজ থেকে এল ! কিগো, কিছু শুনেছ।

¯c‡ivMx

সোমনাথ বলে, না তো।

বাইরে থেকে দেখে কে বলবে, তাদের আসল সম্পর্ক কেমন!

সিঁড়ি দিয়ে তার পিছন পিছন উঠতে উঠতে মালা বলল, তার স্বর আবার নৈর্ব্যক্তিক, যেন সিঁড়ির রেলিংকে বলছে, এইভাবে বলল, রুমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এরা বরের বাড়ির লোকজন। পাকা কথা বলে যাচ্ছে। ট্রেন বন্ধ। ডায়মন্ডহারবারে থাকে। কী করে যাবে! বাপির ঘরটা খুলে দিই।

বাপি এখন আই. আই. টি. থেকে পাশ করে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। তার ঘরটা বন্ধই থাকে। তার পাশেরটাও। সেটার কথাই বলছে মালা। মালার এইগুলো আছে। কাউকে বিপদে পড়তে দেখলেই...

সোমনাথ তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলল, টুপাই কোথায়?

—দুপুর থেকেই রুমার কাছে ঘেঁষে বসে আছে। তোমার কাচানো জামাকাপড় ঘরে দিয়ে গেছে মিনতি। চাবি নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে বলল মালা, এই মেয়েটার বিয়েটা যেন ভাল হয়, কারও কারও তো আবার দুটো বিয়েতেও...

সকালে বাজার গেল সোমনাথ। রোববার সকালটায় সে যায়। ফেরার পথে দেখে রিকশায় সুবীরবাবু। তাকে দেখে থামলেন।

—কোন দিকে যাচ্ছো, বাড়ি!

—হ্যাঁ।

—চলো তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাই।

—কেন স্যার, আপনি আবার।

—চলো না। জানো তো কালকে কী কাণ্ড হল।

—কী হল স্যার।

—কাল সন্ধেবেলা দেখি ভিজতে ভিজতে শ্যামশ্রী এসে হাজির। কাল তো ট্রেন বন্ধ ছিল। জানো তো!

—শুনেছি।

—তিন ঘণ্টা নাকি স্টেশনে বসে ছিল। তারপর রিকশা না পেয়ে, অতটা হেঁটে আমাদের বাড়ি এসেছে। ভাব একবার।

সোমনাথ বলল, হেঁটে?

—হ্যাঁ। ভিজে একেবারে সপসপে। রাতে আমাদের ওখানেই ছিল। এই ট্রেনে তুলে দিয়ে আসছি। অসুখে না পড়ে মেয়েটা। তারপর তুমি কাল কতক্ষণ ছিলে?

—আমিও বৃষ্টিতে আটকে পড়েছিলাম স্যার। সন্ধের পর ফিরেছি। আমিও রিকশা পাইনি।

—শ্যামশ্রী অবশ্য বলল, কলেজের সামনে দিয়ে এলাম কিন্তু কাউকে দেখলাম না। ঘর অন্ধকার।

¯c‡ivMx

—কাল সন্ধেবেলা তো লোডশেডিং হয়ে গেল স্যার।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তাই তো।

—আর আমিও দরজার পাল্লাটা ভেজিয়ে...মোম জ্বেলে... সোমনাথের বাড়ি এসে গেল। নামল সোমনাথ। যাই স্যার।

—হ্যাঁ, কলেজে দেখা হবে। তুমি আসছ তো।

—আমি রোজই আসছি। আপনাদের স্পেশাল ক্লাস আবার কবে ?

—পরশু। আমাদের নয়। আমার একা।

—কেন স্যার ?

সুবীরবাবু হাসলেন, কেন মানে, কী বলব ! মনিকাঞ্চন তো বেড়াতে যাচ্ছে ফ্যামিলি নিয়ে। আর শ্যামশ্রী বলল, যে, ছুটির সময়টা ও আর আসতে পারবে না। ডিপার্টমেন্টের অন্য দু'জনকে তো পাওয়া যায় না। তুমি জানো। কাউকে তো করতে হবে। চলি। তবে মেয়েটা বোধহয় থাকবে না আমাদের কলেজে।

—কোন মেয়েটা ?

—শ্যামশ্রীর কথা বলছি। খুব ব্রাইট মেয়ে। আমার মেয়ের চেয়ে মোটে তিন বছরের বড়। তোমার বউদি আর সোনার সঙ্গে গল্প করছিল কাল। ফুলটাইম কাজ শিগগিরই পেয়ে যাবে কলকাতায়। তাতেই বুঝলাম। তা ছাড়া নাটক করে। রিহার্সাল থাকে।

—রিহার্সাল ?

—হ্যাঁ, গ্রুপ থিয়েটারের। আমি অবশ্য প্রিন্সিপালকে বলে এখানে ওকে ফুলটাইম করা যায় কিনা দেখছিলাম। উনি চেষ্টাও করছিলেন। ঠিক পেয়ে যাবে একটা কিছু। তবে মেয়েটা বড় খেয়ালি। ইমপালসিভ !

মানে !

—এমনিতে গুণী মেয়ে কিন্তু এক্ষুনি এটা ইচ্ছে হল তো এটাই চাই। যে কোনও মূল্যে। আবার পরের দিন ওটা ভাল লাগে তো ওটাই সব। এই ক'দিন যা বুঝতে পারছি। ভাবনা হয়।

—আপনার মন খারাপ লাগছে স্যার।

—না, কী জানো, আমার নিজের মেয়ে হলে ওকে দু-একটা জিনিস বোঝাতাম। কিন্তু নিজের মেয়ে তো নয়। কিছু যদি মনে করে।

সুবীরবাবু হাসলেন। ও, আচ্ছা চলো চলো ! তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ দেখল, রোদ্দুর উঠছে। এই সকাল আটটায়। কাল রাতের ঝড় বৃষ্টির মেঘ সকালেও রয়েছে। তাই সূর্য উঠতে দেরি। সকালের রোদ্দুর আজ বেশ স্নিগ্ধ। আগের রাতের বৃষ্টির পর রোদ্দুর যেমন হয়। সোমনাথের মনে হল, রোদ্দুর তার সন্তানস্নেহ ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীতে। সোমনাথের বাবা কত অন্য অন্য চেহারায় নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন আজও। মুছে যাননি।

সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে মালার মুখোমুখি। আমি একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে

¯c‡ivMx

দুটো হবে। টুপাই রুমাদের ঘরে রইল।

স্নানের পর নিজের ঘরে এসে সোমনাথ টুপাইয়ের ড্রয়িং-খাতা খুলে কিম্ভূতকিমাকার ছবিগুলো দেখছিল। রুমা এসে দাঁড়াল।

—এসো রুমা। টুপাই তোমাদের ওখানে দুষ্টুমি করছে না তো।

—টুপাই এখন মায়ের কাছে বসে আটা মাখছে। একটু পরে রুটি বেলবে।

সোমনাথ হেসে ফেলল। বাঃ। খুব কাজ করছে তা হলে! বসো।

রুমা বসল না। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা চলে যাচ্ছি।

—হ্যাঁ। শুনলাম তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। খুব ভাল খবর।

—আপনার কাছে তো ভাল খবর বটেই। কিন্তু বিয়ে তো সেই অঘ্রাণে। আমরা এই মাসেই চলে যাচ্ছি।

সোমনাথ অবাক হয়, তোমরা মানে?

—আমি, মা আর বাবা।

—কই, সেটা তো শুনিনি।

—বাবা কোয়ার্টার পেয়ে গেছে। হঠাৎই। এত দিন কোয়ার্টার পায়নি বলেই তো... সোমনাথ খানিকটা থমকে গিয়ে বলে, কিন্তু তোমরা তো এই সেদিন এলে।

—হঠাৎ পেয়ে গেল বাবা!

রুমা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জানলার ধারে। মুখটা থম থম করছে।

—আপনাকে একটা কথা বলব বলে এলাম।

—বল, কী কথা।

—আপনার গান কিন্তু আমি শুনেছি। আপনি শোনাতে চাননি, তাও আমি শুনেছি।

—সে কী। কোথায় শুনলে?

—কলেজে।

—ও, সে দিন তুমি ছিলে বুঝি। কোথায় ছিলে? আমি দেখিনি তো।

—আপনি কী করে দেখবেন। আপনি তো চোখ বন্ধ করে গাইছিলেন। অবশ্য চোখ খোলা থাকলেও কি আর আপনি আমাকে দেখতে পেতেন। আপনি তো আমাকে কখনও দেখতে চাননি।

—কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে?

—পিছনে। একেবারে শেষ রোয়ে। সাউন্ড বক্সটার একটু দূরে। বাড়ি ফিরতে দেরি হয়ে গেছিল। মা রাগ করল। বললাম আপনার গান শুনতে গিয়েছিলাম। আর কিছু বলল না। আমি ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে ফিরব।

—ফিরলে না কেন!

—ফিরলাম না! আমি অপেক্ষা করছিলাম পিছনে। দেখলাম আপনি গল্প করছেন।

—গল্প করছি।

¯c‡ivMx

—আমাদের ইংরেজির ম্যাডামের সঙ্গে। চলে এলাম।

—বেশ সন্ধে হয়ে গিয়েছিল তখন। একা আসাটা...

সোমনাথ কথা হারাল।

রুমা বলল, আমি বুঝতে পেরেছি।

সোমনাথ সচকিত, কী ? কী বুঝতে পেরেছ।

—আমি বুঝতে পেরেছি আপনি কেন আমাকে গান শোনাতে চাইতেন না। সেদিন আপনার গান শোনার পর আমি বুঝতে পেরেছি।

সোমনাথের ধাঁধা লাগে আবার, কেন আমি গান শোনাতে চাইতাম না ? মানে ?

—যে অমন গান গায় সে কি একবার বললেই যাকে তাকে গান শোনায় কখনও ! কক্ষনও শোনায় না।

—রুমা !

—আপনি দেখবেন, আর কখনও আমি আপনার কাছে গান শুনতে চাইব না। কক্ষনও চাইব না।

সোমনাথ কী করা উচিত বুঝতে পারে না, রুমা শোনো, ব্যাপারটা অমন নয়।

রুমা তার দিকে তাকায়। রুমার চোখ শান্ত।

—আমার সেই মোমবাতিটা দিন।

—মোমবাতি ?

—হ্যাঁ, সেই যে একদিন আলো নিভে গেল, আর আমি মোমবাতি নিয়ে এলাম। আর আপনি আমাকে গান শোনালেন না।

মনে পড়ে সোমনাথের। হ্যাঁ। ঠিক বলেছ মোমবাতি।

রুমা হাত পাতে, দিন। আমি তো ওকে রেখে গেলাম, সেই জানলার কাছে, রেখে গেলাম, গান শুনবে বলে। যে-গান আমি শুনতে পেলাম না সেই গান যদি ও শুনতে পায়। তাই তো রেখে গেলাম। আপনার জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে আর শুনবে। এখন তো আমার গান শোনা হয়ে গেছে। এখন দিন আমার মোমবাতি।

রুমার পেতে রাখা করতলের দিকে তাকায় সোমনাথ। বলে, মানে, ওটা যে, কোথায় আছে, মানে পরে খুঁজে দেখব। তোমার জন্য, মানে, ওটা হারিয়ে গেছে তা নয়, আমার কাছেই, মানে, ওই ঘরটায় হয়তো আছে, আমি, এক্ষুনি...

রুমা হাত ফিরিয়ে নেয়। বলে, থাক। ওটা আপনার কাছেই থাক। ওটা হারাবে না। মাঝে মাঝেই যখন জ্বলবে ওই মোমবাতিটা নিজে নিজেই জ্বলবে, আর আপনার মনে পড়বে আপনি আমাকে গান শোনাননি। যদিও আমি শুনে নিয়েছিলাম আড়াল থেকে, কিন্তু আপনি শোনাননি...

¯c‡ivMx

তার চোখ ভরে উঠল জলে, দুটো ফোঁটা গাল বেয়ে নামল। লম্বা লম্বা ফরসা আঙুল সেই জল মুছে নিল চকিতে। সোমনাথ একটা কথাও বলতে পারল না।

১৩

রুমারা আজ চলে গেল। ভাড়াটেদের অবিরাম আসা যাওয়া দেখতে অভ্যস্ত মালাও ওই সময়টা থাকতে কষ্ট হবে বলে, সকাল সকালই বেরিয়ে গেছে টুপাইকে নিয়ে। বোনের বাড়ি যাবে। টুপাইয়ের মায়ের সঙ্গে টুপাইকে দেখা করাতে হবে। বাড়িতে থাকতে হচ্ছে সোমনাথকে। চাবিটা ওরা সোমনাথের হাতেই দিয়ে গেল। রুমার বাবা মা বলল, যাবেন কিন্তু। সোমনাথ আশ্বাস দিল বাঁকিপুর তো, পাঁচটা স্টেশন। চলে যাব। তা ছাড়া রুমার সঙ্গে তো দেখা হবে কলেজে। ওর সঙ্গেই চলে যাব না হয়।

বলল, তবে সে সবই যে কথার কথা সোমনাথ জানে।

রুমাও জানে।

মা যখন বলল, প্রণাম করো, প্রণাম করে রুমা অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। সোমনাথের চোখে চোখ রাখল না।

রিকশা ছেড়ে দেবার পর মুখ ফেরাল একবার। সেই মুখ বৃষ্টি ভেজা জ্যোৎস্নার মতো থমথমে।

সোমনাথ ফিরল। ফিরে উঠোনে পা দেওয়া মাত্র তার বুকে অবর্ণনীয় কষ্ট ধাক্কা দিল। ওই উঠোন। ওই ওখানটায় দাঁড়াত। ঘরে এসে মনে হল, ঘরে আসত। থাকতে পারল না সোমনাথ। ছাদে চলে গেল। ছাদে গিয়ে মনে হল, তার খোঁজে শেষ রাতে ছাদে উঠে এসেছিল একদিন। পাল্লা খোলা দরজার মতো হাওয়ায় হা-হা করছে সোমনাথের ভেতরটা। সোমনাথ দৌড়ে নীচে গেল। ওদের ঘরের সামনে দাঁড়াল। ওরা থাকাকালীন, ওদের ঘরে যায়নি কখনও। দেখল তালা দেওয়া দরজায়। কিন্তু জানলা খোলা। চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল সোমনাথ। জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকছে দুপুর। বাইরে গাছ। মেঝেতে তার ছায়া পাতার ঝিলিমিলি। দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার। হাওয়ায় একটু একটু দুলছে। আর কিছু নেই। আর কিচ্ছু নেই।

এই ঘরটায় ওই মেয়েটা থাকত। তার গান শুনতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জেগে থাকত উঠোনে সারা রাত। দাঁড়িয়ে থাকত বারান্দায় ? সারা রাত ? পুরো সারা রাত ? ওইটুকু মেয়েটা ! এই ঘরে, ওই বারান্দায়, ওই উঠোনে কত ঘুরেছে, হেঁটেছে মেয়েটা ! তাই না ! এই সব ধুলোয় ! সোমনাথ লক্ষ করেনি তখন। সোমনাথ নিচু হয়ে বসে সেই ধুলোর ওপর নিজের দুটো হাতের পাতা রাখল। এইসব ধুলোর ওপর মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল।

এখন চলে গেছে। কিন্তু সেই চলে যাওয়াটুকু তো আছে। দু হাতের পাতা

¯c‡ivMx

ধুলোয় রেখে সেই চলে যাওয়াটুকু স্পর্শ করল সোমনাথ। চলে যাবার আগের দাঁড়িয়ে থাকাটুকু। থাকাটুকু স্পর্শ করল। নিজের ঘরে ফিরতে ফিরতে তার হঠাৎ মনে হল সেই পাখিটার কথা। বাবলা গাছের ডাল থেকে পুকুরের ওপর দিয়ে সরকার বাড়ির ছাদের ওপারে তার উড়ে যাওয়া! সে জিনিস তো আজও আছে সোমনাথের কাছে।

তা হলে কি এও থাকবে? সারা জীবন!

সোমনাথের মনে হল, রাতে সোমনাথ ঘুমোবে কী করে। চোখ বন্ধ করলেই তো মনে হবে, ও দাঁড়িয়ে আছে। নীচের উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। সারা রাত। কী করে ঘুমোবে সোমনাথ?

সোমনাথ বুঝতে পারল, সেই হারিয়ে হাওয়া মোমবাতিটা সোমনাথের ভিতরে জ্বলে উঠেছে নিজে নিজেই।

নাকি মোমবাতি নয়? অন্ধকার একটা ফুলগাছ। জ্বলতে শুরু করল এবার।

সেই গাছের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, সে বলছে, গান শোনাননি, আপনি আমাকে গান শোনাননি, আমি আপনার দিকে তাকাব না...

সোমনাথ বুঝতে পারল, এই তা হলে প্রেম! সোমনাথ বুঝতে পারল এত দিনে তার সুর লেগেছে।

সে বলতে লাগল, তার চেয়ে প্রায় পঁচিশ বছরের ছোট একটি মেয়েকে সে বলতে লাগল, তুমি জানো না, তুমি আমার জীবনের সেই পর্দা যেখানে সুর লেগেছে, হয়তো অজান্তে, আর সুর তো অজান্তেই লাগে, রুমা, রুমাঝুম, তুমি আমার সেই সুর লাগা পর্দা, তোমাকে গান শোনাব না, কখনও হয়? সারা জীবন গান শোনাব তোমাকে, মনে মনে গান শোনাব, সে তুমি যেখানেই থাকো না কেন, যখনই গান গাইব, মনে জানব তোমার দিকেই যাচ্ছে আমার গান...

সোমনাথ দেখল, দরজার কাছে দাঁড়িয়েছে মেয়েটি, একবার মুছে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, ওই ফিরে এল, তার বৃষ্টিভেজা জ্যোৎস্নার মতো থমথমে মুখ ভেসে যাচ্ছে জলে...

সোমনাথ মনে মনে সেই মুখ দু'হাতের মধ্যে ধরে মনে মনে সব অশ্রু শুষে নিতে চাইল কিন্তু তার কপাল ধাক্কা খেল দরজায়, তার মুখে লাগল শুধু নিজেরই চোখের জলের লবণ।

সোমনাথ আচ্ছন্নের মতো স্নানঘরে ঢুকে ঝরনা খুলল।

স্নানঘর কান্নার জায়গা।

স্নানঘর গানের জায়গা।

জল বলে চল মোর সাথে চল এ আঁখি জল হবে না

¯c‡ivMx

বিফল কখনও হবে না বিফল কখনও হবে না বিফল...

ঝাপসা চোখে স্নানঘরের জানালায় তাকাল সোমনাথ।
ঝাপসা চোখেই, জানলায় গুঞ্জনকে দেখতে পেল।

এসো গুঞ্জন। আমার জীবনে প্রেম এসেছে আজ।
সুর লেগেছে। তুমি আসবে না ?

সোমনাথ দেখল, স্নানঘরের জানলা দিয়ে উড়ে এল গুঞ্জন।
গুঞ্জন, তার মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া স্নানজলে মিশে গেল।

গানের ঝরনাতলায় দাঁড়িয়ে স্নান করতে লাগল সোমনাথ।
তার প্রেম বয়ে চলল জলের সঙ্গে।
হয়তো, গানের সেই অদৃশ্য নদীর দিকেই।

¯c‡ivMx

সে সংগীত কল্পনা করেছিল, কিন্তু গাইবার সামর্থ্য পায়নি। তেমনই তার সামর্থ্যের ওপারে দাঁড়িয়েছিল প্রেম। তবু গানের কোন ঝরনাতলায় এসে একদিন মিলিত হল গান আর প্রেম! কীভাবে জ্বলে উঠল অন্ধকার ফুলগাছে আলোর ফুল! তারই নিবিড় আলেখ্য এই উপন্যাস।

•

তার নাম সোমনাথ। কলেজের অধ্যাপক। সারাক্ষণ সে যেন গানের বলয়ে বাস করে। গান তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তবু সে মনে করে, গান গাইবার কোনও অধিকার তার নেই। নেই কোনও সামর্থ্য। কেননা প্রথাগত শিক্ষা সে পায়নি। ওর গান-পাগল বাবা আর সংগীতপ্রেমী হেডমাস্টার মশাইও মনে করতেন এই কথা। অথচ গান দিয়েই তৈরি এই মানুষগুলির অন্তর-অনুভব-পৃথিবী।

একসময় সোমনাথের জীবনে ওই গানের সূত্রেই আসে রক্তমাংসের নারী। কিন্তু প্রেম আসে না। গান হারিয়ে যায়। কত দিগন্তছোঁয়া বেদনা সোমনাথকে ছুঁয়ে থাকে নিয়ত। যন্ত্রণার অন্ধকারে তাকে গাছের মতো দাঁড় করিয়ে রাখে তারা। তবু গানেরা একদিন তার কাছে ফিরে আসে। আসে স্নেহ, প্রেম। এই উপন্যাসে জয় গোস্বামী রচনা করেছেন এক অন্যতর স্বপ্নসুরলোক।

প্রচ্ছদ কৃষ্ণেন্দু চাকী

আনন্দ পেপারব্যাক
উপন্যাস
মূল্য ৪০·০০

9 788172 157098